শান্তিধারা

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী
প্রণীত

মূল্য বার আনা।

প্রকাশক
মোহাম্মদ আওলাদ আলী চৌধুরী
১০২নং বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা।

তৃতীয় সংস্করণ

পৌষ, ১৩৩৪

প্রিণ্টার
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী প্রেস
২৯ নং, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা।

প্রথম ধারা

ইস্‌লামের স্বরূপ

প্রভাতের শুভ্র করস্পর্শে নিশার নিবিড় তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির উদার মুক্ত নগ্ন মূর্ত্তি যেমন করিয়া নয়ন-সমক্ষে ফুটিয়া উঠে, বৃক্ষে বৃক্ষে ক্ষুদ্র কিশলয় রেখায় রেখায় প্রকাশিত হয়, তৃণ-পল্লবে শিশির-বিন্দু উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়, তেমনই "ইস্‌লাম" এই একটি মাত্র কথায় মুসলমান ধর্ম্মের সমগ্র মূর্ত্তি, ইহার নিগূঢ়তম দৃশ্য, ইহার ভিতর ও বাহির অতি উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়। পুষ্পের সুগন্ধমাত্র আঘ্রাণে যেমন তাহার স্নিগ্ধমধুর কোমল মূর্ত্তি অন্তর মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তেমনই "ইস্‌লাম" শব্দমাত্র উচ্চারণে মুসলমান-ধর্ম্মের সমস্ত রূপ ও রসের সহিত পরিচয় হইয়া যায়।

নামের এমন মহিমা, ভাবের এমন দ্যোতনা, শক্তির এমন ব্যঞ্জনা আর কোথায়ও দেখি নাই। মুসলমান জাতির

প্রাণশক্তির স্প...

গরীয়সী শক্তি-মহিমা এই "ইস্‌লামে"র মধ্যেই প্রকটিত। পারস্যের মহিমময় রাজশক্তি যাহার বলে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহা তরবারি নহে; রোমের বিজয়শীল রণশক্তি যাহার বলে নিষ্প্রভ হইয়া গেল, তাহা বর্শার ফলক নহে,—তাহা "ইস্‌লাম"। কিন্তু ইস্‌লাম বর্শার ফলক নহে, কৃপাণের সুতীক্ষ্ণ ধার ইস্‌লাম নহে, বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দুর্দ্দম্য রণ-শক্তির হুঙ্কারে ও বিজয়ের দুন্দুভি-নির্ঘোষে ইস্‌লাম প্রকাশিত নহে। পুষ্পের যাহা সুরভি, পল্লবের যাহা শ্যামলতা, দিগন্তবিস্তৃত গগনের যাহা অসীম নীলিমা, ইস্‌লাম মানবাত্মার তাই। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যুগের ...র যুগ ধরিয়া গিরি-গহ্বর ও কানন-কান্তারে অস্ফুট মানব-চিত্তে যে অসীমের অনুভূতি জাগিয়াছে, হিম-ঝঞ্ঝাময় পর্ব্বত ও উর্ব্বর নদী-সৈকতে, জ্বালাময় মরুভূমি ও স্নিগ্ধ-শ্যামল সমতল ক্ষেত্রে, কুটীরে-কুটীরে, হর্ম্ম্যে-হর্ম্ম্যে নিখিল জগতের অধিরাজ, সকল মঙ্গলের নিলয় করুণাময় বিশ্বপাতার উদ্দেশে মানবাত্মার যে আকুল আবেগ, যে গভীর নিবেদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, "ইস্‌লাম" তাহারই প্রকাশ। সেই অবাঙ্‌মানসগোচর চিরবাঞ্ছিত-প্রভুর জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় মানব-প্রাণ যে নিত্য

শাশ্বতসুরে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে, "ইস্‌লাম" সেই সুরেরই সম্পূর্ণ ঝঙ্কার।

এই জন্যই পৃথিবীতে বিশ্ব-পতির বাণী প্রচার করিবার জন্য যুগে যুগে যত তত্ত্ববাহক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, মুসলমান তাঁহাদের সকলকেই মানিয়া লইয়াছে,—হজরত ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসার ধর্ম্ম ইস্‌লাম ধর্ম্ম বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। খৃষ্টানের জোব—মুসলমানের আইয়ুব নবীর জীবনে যে আশ্চর্য্য ঈশপ্রাণতা বিকশিত হইয়াছে, স্বীয় সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া খোদাতালার বিধান সসম্মানে ও সানন্দে মানিয়া লইবার যে অতুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা "ইস্‌লাম"। আর সেই জন্যই মোস্‌লেম-কণ্ঠে তাহার জয়ধ্বনি যুগ যুগ ধরিয়া উচ্চারিত।

স্রষ্টার উদ্দেশে মানবের আকুল আত্মনিবেদন, একান্ত আত্ম-সমর্পণ ও গভীরতম নির্ভরের ভাব "ইস্‌লামে"র মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছে। শুভ সেই মুহূর্ত্ত, যখন মানব-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল "আস্‌লাম্‌তো"—হে প্রভো! আমি তোমাতেই আত্ম-সমর্পণ করিতেছি; আমার সর্ব্বস্ব তোমাকেই নিবেদন করিতেছি; তোমার সমস্ত নির্দেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি; সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, আনন্দে ও বিষাদে, হে স্বামি! তোমারই

নির্দ্দেশ আমার মাথার মণি ; তোমার যাহা দান, তাহাই আমার নিকট স্নেহের আশীর্ব্বাদ। হে নিয়ন্তা! আমার জীবনে, কর্ম্মে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার জীবন-বীণার তারে তারে হে দয়িত! তোমারই ইচ্ছার রাগিণী নিত্য বাজুক, আমার জীবন-সায়রে হে সুন্দর! তোমারই ইচ্ছার কমল নিত্য বিকশিত হউক।

ইহাই "ইস্‌লাম"। খোদাতালায় সম্পূর্ণরূপে আপনাকে অর্পণ করা, সেই মহাসম্রাটের দরবার হইতে যাহা কিছু আসে, ফুল্ল মনে তাহাই গ্রহণ করা, তাহারই ইচ্ছা-সিন্ধু-নীরে আপন ইচ্ছা-বুদ্বুদমিশাইয়া দেওয়া—ইহাই "ইস্‌লাম"। আরবের নব মোস্‌লেম এই "ইস্‌লামের"ই সাধনা করিয়াছে। এমন নির্ব্বিকার নির্ভরের ভাব-ধ্বনি বলিয়াই ভারতের মলয়জশীতল কৌমুদীফুল্ল শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে ইস্‌লামের উদ্ভব হয় নাই, চির-শিশিরপাত-স্নিগ্ধ নীলনদের কল্লোলে "ইস্‌লাম" প্রথম ধ্বনিত হয় নাই; অথবা বস্‌রার গোলাপকুঞ্জে "ইস্‌লাম" প্রথম প্রস্ফুটিত হয় নাই;—কিন্তু মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কর-বর্ষণে ধরিত্রী যেখানে কঠিন-বক্ষা, প্রকৃতি যেখানে দারুণ হাহা-শ্বাসে নিত্য-অগ্নি-ক্ষরা, জীবন যেখানে রসহীন, শূন্য ও নিরানন্দময়, সেই কঠিন মরু আরবের বক্ষেই "ইস্‌লাম" উচ্চ উদাত্ত স্বরে প্রথম উচ্চা-

রিত হইয়াছে। এইখানেই মরণমুখ ময়ুখমালার নীচে প্রাণধ্বংসী 'লু'র মাঝে, শত্রুর অস্ত্রবর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষ প্রথম "ইস্‌লাম"কে বরণ করিয়া লইয়াছে,—ভগবৎ-সকাশে মানবের আত্ম-নিবেদন সুরলয়ে বাজিয়া উঠিয়াছে—মানুষ প্রথম বলিয়াছে, "আমি মোস্‌লেম ;—হে খোদা-তালা ! আমি তোমারই দাস ; জীবনে তোমাকেই বরণ করি, মরণে তোমাকেই কামনা করি। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, প্রভো, তবে অনাহারে এ দেহ শীর্ণ ও শুষ্ক হউক, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে এ দেহ জর্জ্জরিত ও শোণিতাক্ত হউক, নির্ম্মম অত্যাচারে এ জীবন পিষ্ট হউক,—আমি মানিয়া লইব। দাও, দাও, হে মহান্‌, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমার সাজান বাগান শ্মশান করিয়া দাও, আমার কক্ষভরা স্বর্ণ-কলস জলধির বিশ্বপ্লাবিনী ঊর্ম্মিমালায় মিশাইয়া দাও, ভীম করাল কলম্ব হইতে কুলিশের উপর কুলিশ হানিয়া, অগ্নির উপর অগ্নি বর্ষণ করিয়া, ঝঞ্ঝার উপর ঝঞ্ঝা বহাইয়া আমার অতি আপন, প্রাণের ধন-জন-পরিজনকে রেণু রেণু করিয়া দাও, আমি মানিয়া লইব।"

ইহাই "ইস্‌লাম"—ইহাই মোস্‌লেমের ধর্ম্ম। জীবন-বীণা এই সুরে বাঁধিয়াছিল বলিয়া-ইস্‌লাম প্রচারের প্রথম যুগে মহাপুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুষ্টিমেয় মুসলমান অর্থ-

হীন, বলহীন ও স্বজনত্যক্ত হইয়াও শত অবমাননা, অনাহার ও অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করিয়াছে ; অসংখ্য শত্রুর অস্ত্রবর্ষণের মধ্যে অটলভাবে দাঁড়াইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। লীলাময় খোদাতালার নিদেশ জীবনে এমন ভাবে মানিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই হজরতের বুকের ধন —মুসলমানের চোখের মণি প্রাণপ্রতিম এমাম হাসান হলাহলের পেয়ালা অম্লান বদনে মুখে তুলিয়া দিয়াছিলেন, মহাবীর এমাম হোসায়ন কারবালার অগ্নিময় প্রান্তরে কঠোর মরণ বরণ করিয়াছিলেন,—ক্ষোভের একটি অক্ষরও উচ্চারণ করেন নাই, দুঃখের একটি নিঃশ্বাসও পরিত্যাগ করেন নাই! কারবালার সেই ভীষণ শ্মশানে এক বিন্দু জলের জন্য স্নেহের পুষ্পগুলি একটি একটি করিয়া শুকাইয়া পড়িয়া বিধাতার বিধান যখন ভীষণভাবে পরি-স্ফুট করিয়া তুলিল, তখনকার এমাম হোসায়নকে মনে কর, প্রাণ-পুত্তলি শিশু তনয়ের বিশুষ্ক কোমলকণ্ঠ সলিল-ধারায় সরস হইবার পরিবর্ত্তে নির্ম্মম শত্রুর বাণাঘাতে মৃণালের মত ছিন্ন হইতে দেখিয়া যখন হোসায়ন-জায়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন, তখনকার হোসায়নের কথা মনে কর, আর যখন মহাবীর হোসায়নের সিংহবিক্রমে ফোরাতকূল শত্রুশূন্য হইয়া গেল,—যখন অঞ্জলি ভরিয়া

অমৃতোপম স্নিগ্ধ সলিল তৃষাতুর কণ্ঠে ঢালিবার জন্য মুখের নিকট তুলিয়াও তিনি তাহা ফেলিয়া দিলেন, তরবারি আঘাতে শত্রুবৃন্দকে ছিন্ন-ভিন্ন ও পলায়নপর করিয়াও তিনি বর্ম্ম-চর্ম্ম, অস্ত্র-শিরস্ত্রাণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঘাতকের অস্ত্রমুখে শরীর পাতিয়া দিলেন, তখনকার এমাম হোসায়-নকে মনে কর,—বুঝিতে পারিবে ইস্‌লাম কি, আর মোস্‌-লেম কি! ছিন্ন-কণ্ঠ পুত্র কোলে করিয়াও তিনি ক্রন্দন করেন নাই, সর্ব্বস্ব হারাইয়াও তিনি হাহাকার করেন নাই, খোদাতালার সমীপে আকুল হইয়া প্রার্থনা করেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন, "হে নিয়ন্তা! আমি 'মোসলেম'—'ইসলাম' আমার ধর্ম্ম। হে প্রিয়তম! এ সকলই যে তোমার দান,—আমি মাথায় করিয়া লই;—এ সকলই যে তোমার বিধান—আমি মানিয়া লই।" আর এই জন্যই ত তিনি একরূপ রণজয়ী হইয়াও অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিলেন,—মরণ বরণ করিলেন—প্রভুর বিধান মানিয়া লইলেন।

এমন করিয়া একান্ত আত্মসমর্পণ ও নির্ভরের ভাবে শক্তিময় জগৎপাতার অনন্ত ইচ্ছা-শক্তির সহিত আপন ইচ্ছা ও অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়াছিল বলিয়াই মুষ্টিমেয় মুসলমানের শক্তির অন্ত ছিল না; নিজের সমস্ত শক্তি

সেই মহাশক্তিধরের শক্তি-সিন্ধুতে হারাইয়া ফেলিয়া তন্মধ্য হইতে মুসলমান যে শক্তি লাভ করিয়াছিল—তাহার দুর্ব্বার তেজের সম্মুখে জগতের তদানীন্তন প্রত্যেক শক্তি বাত্যা-মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল। কেমন করিয়া সংখ্যায় দশ গুণ, বার গুণ অধিক রোমক সৈন্য উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও সুশিক্ষিত হইয়াও মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত আরবের পরাক্রমে পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হই বটে, কিন্তু যখন মনে হয়, রোমকদিগকে যাহারা অবহেলে পরাভূত করিয়াছিল, তাহারা 'মোস্‌লেম,'—'ইস্‌লাম' তাহাদের ধর্ম্ম, তখন আর বিস্ময়ের অবসর থাকে না। খোদাতালায় আত্মসমর্পণ করিয়া মোসলেমগণ যখন শত্রু সৈন্যের উপর আপতিত হইত, তখন তাহাদের মধ্যে ঐশী শক্তিরই তাড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইত, তাহাদের বাহু এক মহাশক্তির প্রভাবে কার্য্য করিত,—শত্রু সে বল সহ্য করিবার ক্ষমতা রাখিত না।

মহিমময় স্রষ্টা, করুণাময় পাতা ও শক্তিময় ধাতার প্রতি সমাহিতচিত্ততা ও তৎসর্ব্বস্বতার এই যে সুর 'ইস্‌লামে'র মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে, মুসলমানের নিখিল জীবনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কেবল সেই সুরেরই বাজনা

উঠিয়াছে। ইস্‌লামের মহামন্ত্র "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্" 'ইস্‌লামের'ই তালে তালে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। ইস্‌লামবাদী মোস্‌লেমের কণ্ঠে যখন উচ্চারিত হয়, "আল্লা ভিন্ন উপাস্য আর কেহ নাই," তখন তাহার নিকট যে শুধু ছত্রিশ কোটী দেবতা, সূর্য্য-চন্দ্র, ভূত-প্রেত, পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ-প্রস্তর প্রভৃতির ঈশ্বরত্ব ধূলিসাৎ হইয়া যায় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় জীবনে পার্থিব প্রতি পদার্থের প্রভাব-প্রভুত্ব সে অস্বীকার করে। ঐ এক ভীষণ "নাই" শব্দে তাহার সকল মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, তাহার সকল লালসা-কামনা, সকল মোহ অসার অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে। সে বলে, "নাই—নাই, হে আমার স্রষ্টা, হে আমার পাতা! তুমি ভিন্ন আর আমার প্রভু নাই; দাস আমি তোমারই, আর কাহারও নহি।—নহি আমি কাম-মোহ-মায়ার সেবক, নহি আমি লোভ-হিংসা-ক্রোধের উপাসক। কাঙ্গাল আমি, নহি ধনের, হে স্বামী! জগতের সকল হীরা-মাণিক তোমারই প্রীতি। বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্য্যচ্ছটা আমার ঈপ্সিত নহে, রাজৈশ্বর্য্যের বিভ্রমময়ী বিলাসলীলা আমার বাঞ্ছিত নহে, অপ্সরাকণ্ঠের পীযূষ-প্লাবিনী সঙ্গীতধারা আমার আকাঙ্ক্ষিত নহে। হে সুন্দর! আমার সকল সুষমার তুমিই ভূষা। হে বাঞ্ছিত! আমার সকল ভোগের

শান্তিধারা

তৃষা। হে প্রিয়তম! আমার সকল গানের তুমিই সুর।"

এই জন্যই মোস্‌লেম-সম্রাট হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মহাপরাক্রান্ত রাজশক্তি ও বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও অমন দীনভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার অঙ্গুলিহেলনে হিরণ্ময় রাজমুকুট ধূলি-ধূসরিত হইয়াছে তিনি সাতদিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধা নিবারণের জন্য পেটে পাথর বাঁধিয়াছেন, দুইটী খোর্ম্মার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইহুদীর হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। মোস্‌লেম-কুল-ভূষণ হজরত আবুবকর সিদ্দিক প্রভুর নামে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিলেন। ধনসমৃদ্ধ রোমকদিগের দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি যখন মহাবীর হজরত ওমরের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধির আশায় শিবিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন বিজয়ী মোসলেম-নায়ক নিজের জন্য ভূতল ব্যতীত উপবেশনের শ্রেষ্ঠতর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। মুসলমানের অন্যতম গুরু হজরত আবুহানিফা বাগদাদের খলিফা মনসুর কর্ত্তৃক কাজীর সম্মানিত পদে পুনঃ পুনঃ বরিত হইয়াও সে সম্মান তুচ্ছ করিয়াছিলেন, খলিফার কোপানলে কারাগারে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন---তবুও তাহা গ্রহণ করেন নাই।

পদ, ঐশ্বর্য্য ও সম্মান মোসলেমগণকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই, ভোগ ও গর্ব্বের লালসা ক্ষণতরে ইহাদের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্‌" ছিল ইঁহাদের জীবনের মন্ত্র; তাই স্বীয় জীবনে খোদা ভিন্ন আর কোনও পদার্থের প্রভুত্ব ইঁহারা স্বীকার করেন নাই। ইঁহাদের প্রাণের সকল সাধ ও লালসা সেই মহাপ্রভুর প্রেমেই সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। জীবনের জন্য একমাত্র খোদাকেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়াছেন, তাই সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ বাষ্পের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের জীবন-সঙ্গীতের সকল রাগিনী স্তব্ধ করিয়া কেবল এই মহারাগিনীই সর্ব্বত্র বাজিয়াছে, "হে আমার রাজা, হে আমার প্রভু, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তুমিই প্রিয়তম; আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমাকেই চাই। 'ইস্‌লাম' আমার ধর্ম্ম, 'লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ' আমার বাণী।"

মুসলমানের কর্ম্ম-মন্ত্র "বিস্‌মিল্লাহ" ঐ ইস্‌লামেরই মূর্চ্ছনায় স্পন্দিত, মুসলমানের বিজয়-ধ্বনি "আল্লাহো আক্‌বর" ঐ ইস্‌লামেরই সুরে ঝঙ্কৃত, মুসলমানের বিস্ময়-বাণী "সোব্‌হানাল্লাহ" ঐ ইস্‌লামেরই মন্ত্রে উচ্চারিত, মুসলমানের হর্ষ-সঙ্গীত "আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহ্‌" ঐ ইস্‌লামের

ভাবে অনুপ্রাণিত। মুসলমানের ভিতর ও বাহির পূর্ণ করিয়া ঐ একই ঈশপ্রাণতা বিকশিত হইয়াছে। মুসলমানের বিজয়ে ও বিষাদে, বিস্ময়ে ও আনন্দে কেবলই এক ধ্বনি উঠিয়াছে "হে স্বামি! তুমি সব, তুমিই সব"। কর্ম্মের প্রারম্ভে মুসলমান বলিয়াছে "বিস্মিল্লাহ্"—হে নিখিল কর্ম্মের কর্ম্মি! কর্ম্ম তোমারই নামে আরম্ভ করিতেছি। আমার কর্ম্ম তোমাকেই নিবেদন করিতেছি। আমার কর্ম্ম-শক্তি তুমি। জয়ী যদি হই, সাফল্যের কাঞ্চন-জঙ্ঘায় যদি পৌঁছিতে পারি, তবে হে দয়িত, সে তোমারই দান। আর আমার সাধনা যদি ব্যর্থ হয়, নিস্ফলতার ধূলিতলে যদি আমি লুটাইয়া পড়ি, সে তোমারই আশীর্ব্বাদ।

সমরাঙ্গনে মুসলমানের কৃপাণঘায় শত্রুকুল যখন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বাষ্পের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে, তখন শত্রুমুণ্ডময় রণক্ষেত্রে বিজয়ী মোসলেম স্বীয় রণশক্তির প্রশংসা করে নাই, সে তাহার বাহুর বল ও তরবারির তীক্ষ্ণতা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে নাই, তাহার সম্রাট ও সেনাপতির জয়ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত করে নাই, তাহার অন্তর মথিত করিয়া শুধু এই নিবোনই বজ্রনাদে বিঘোষিত হইয়াছে— এই জয়ধ্বনিই ব্যোমপথ বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়াছে,

"আল্লাহো আক্‌বর—তুমিই শ্রেষ্ঠ, হে সর্ব্বশক্তিময়, তুমিই শ্রেষ্ঠ। হে নিখিল জগতের সম্রাট, তোমারই জয়, তোমারই জয়।"

মহাগর্জ্জনে উচ্ছল আকুল জলপ্রপাতের ফেনিল ধবল চপল জলে হৈম-রবির কিরণমালা নানাবর্ণে ফুটিয়া ফুটিয়া মন যখন বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া ফেলে, বিশ্বযন্ত্রের মহিমা ও কৌশল-চিন্তায় বুদ্ধি যখন বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া উঠে, জাগতিক ঘটনা-পরম্পরার অচিন্তনীয় বিকাশে রাজাকে ফকির ও ফকিরকে রাজা হইতে দেখিয়া হৃদয় যখন ভাবাবেশে বিকশিত হইয়া উঠে, তখন জর-জর তনু, রোমাঞ্চিত-কলেবর, শিথিলাঙ্গ মুসলমান আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, জগৎ বিস্মৃত হয়, তাহার অবশ-বিবশ কণ্ঠ ভেদিয়া ফুটিয়া উঠে, "সোব্‌হানাল্লাহ—হে লীলাময় তুমিই পবিত্র।" অসাধারণ কর্ম্মশক্তিবলে ক্ষুদ্র-শক্তি মানুষ যখন অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া কল্পনার সামগ্রীকে বাস্তবের বর্ণরাগে সজীব ও উজ্জ্বল করিয়া তুলে, তখনও মুসলমান বলে "সোব্‌হানাল্লাহ্—হে ভগবান! তুমিই পবিত্র"। পরের সেবা ও রক্ষার জন্য আত্মদান করিয়া মহিমার মহালোকে ক্ষুদ্র নর যখন সপ্তসূর্য্য জিনিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহত্ত্বে গগনেরও ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করে, তখনও মুসলমান বলে "সোব্-

হানাল্লাহ্—হে মহিমময় তুমিই পবিত্র।" মুসলমানের বিস্ময়বিমূঢ় অন্তরে আর কোন শক্তিরই প্রভাব অনুভূত হয় না, তাহার নিশ্চল নয়নে আর কিছুই প্রতিবিম্বিত হয় না, তাহার শিরায় শিরায় ছুটে, তাহার রোমে রোমে ফুটে "সোব্হানাল্লাহ্, সোব্হানাল্লাহ্"। সে দেখে সকল শক্তির মধ্যে তাঁহারই দ্যুতি, সকল গরিমার মধ্যে তাঁহারই মহিমা, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে ভুবন ভরিয়া তাঁহারই অঙ্গরাগ।

"আল্হাম্দো লিল্লাহ্" মুসলমানের বিস্ময়াবহ মহাবাণী। মুসলমান হাসিয়া বলে "আল্হাম্দো লিল্লাহ্," কাঁদিয়া বলে "আল্হাম্দো লিল্লাহ্"; আনন্দেও তাঁহারই গুণ-কীর্ত্তন করে, বিষাদেও তাঁহারই প্রশংসা উচ্চারণ করে। সৌভাগ্যের পূর্ণশশী হইতে সুখাংশু যখন জীবনের উপর হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়ে, প্রাণ যখন একবার অনির্ব্বচনীয় সুখের অতলস্পর্শ সিন্ধু-সলিলে নিমজ্জিত হইয়া মুক্তার ঝলকে ঝলকে বিচরণ করে, আবার স্বর্গীয় পুলকের উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে, ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর গ্রামে আরোহণ করিয়া অমৃত-রসে পরিপূর্ণ হয়, তখন অবনত মস্তকে পরিপূর্ণ অন্তরে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে মোসলেম বলে "আল্হাম্দো লিল্লাহ্—হে খোদাতালা! আমি তোমারই

প্রশংসা করি ; তুমিই মহান্‌, তুমিই প্রধান, তুমিই সুন্দর। এ জীবন তোমারই কৃপা, এ সুখ তোমারই করুণা, এ হর্ষ তোমারই দান। তৃণ আমি, হে মহান্‌! তোমারই কৃপার সলিলধারায় সরস হইয়া, তোমারই করুণার শিশির-বিন্দু মাথায় ধরিয়া সজীব ও সুন্দর হইয়াছি। বালুকণা আমি, হে জগদীশ! তোমারই স্নেহের কিরণপাতে শত সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল হইয়াছি, কাঞ্চন জিনিয়া মোহন হইয়াছি।"

আবার দুঃখের কালমেঘ যখন জীবনের ব্যোমপথ আচ্ছন্ন করিয়া ঘনাইয়া আসে, আশার আলোক-রেখা যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অন্ধকারের নিবিড় কায় মিলাইয়া যায়, দুর্দ্দশার তরঙ্গঘায় সম্মুখে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে সৌভাগ্য যখন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে, তখন মুসলমান বলে "আল্‌হামদো লিল্লাহ্‌—হে মঙ্গলময়, করুণার তোমার সীমা নাই।" আঘাতের উপর আঘাতে নিঃশ্বাস যখন রুদ্ধ হইয়া আসে, স্নেহের কমলদল যখন সম্মুখে দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া ঢলিয়া পড়ে, তখনও মোস্‌লেম কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ্‌—হে লীলাময়, তুমিই ধন্য।" ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিয়া সে বলে, "মহিমা তোমার কি বুঝিব মহারাজ! দীন আমি কি

কহিব তোমার স্নেহের বারতা! ভোগের মোহপঙ্কে আমি ডুবিয়া মরিতেছিলাম, তুমি বড় দয়া করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছ, মায়ার ফাঁদে আমি জড়াইয়া মরিতেছিলাম, তুমি করুণা করিয়া মুক্ত করিয়াছ। আমার ভাগ্য-গগন অন্ধকার করিয়া যে তিমির-রাশি নামিয়া আসিয়াছে, তাহা তোমারই ঘনীভূত স্নেহ; তাহার স্পর্শে তোমারই সত্ত্বা জাগরিত হইয়াছে। আমার চারিদিকে ভীষণ রবে বিপদের যে বিদ্যুৎ চমকিয়াছে, তাহাতে নয়ন অন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়—হে প্রেমময়! তোমারই রূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে।"

এই নিখিল-কিরণ-কারণ-রূপ এমনই করিয়া মোস্‌লেম-জীবনের অঙ্গে অঙ্গে প্রভা বিস্তার করিয়াছে, এই ভুবন-জীবন-মহিম-জ্যোতিঃ শোক-সন্তাপ ও বেদনার মধ্যে মোস্‌লেমের নয়নে নয়নে ঝলসিত হইয়াছে। স্বজনের মৃত্যু-সংবাদে, ধ্বংস ও সর্ব্বনাশের সমাচারে যখন প্রাণ দুঃসহ শোক ও ব্যথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে,—হৃদয় যখন রুদ্ধ যাতনায় শতধা বিদীর্ণ হইতে চায়, তখন ইসলামবাদী হাহাকার করিয়া কাঁদিতে শিখে নাই। মোসলেম-প্রাণ মথিত করিয়া জগৎ স্তম্ভিত করিয়া বাণী উঠিয়াছে, "ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলায়হে রাজেউন—আমরা তোমারই জন্য আছি, আমরা তোমারই দিকে ফিরিয়া যাইব।" হে

প্রভো। তোমারই ইচ্ছায় আমাদের সৃষ্টি-স্থিতি জীবন-মরণ। আমরা ধনের নই, যশের নই, আত্মীয়ের নই। হে নাথ! আমরা শুধু তোমারই, আর তোমারই দিকে আমাদের যাত্রা। তাই বিয়োগে আমাদের ব্যথা নাই, মরণে আমাদের শোক নাই, ধ্বংসে আমাদের দুঃখ নাই। এ মহাযাত্রার আশে পাশে চারিদিকে কত জনের সহিত পরিচয় হইয়াছে, কত মোহ-মায়ার ছবি দেখা গিয়াছে, কত স্নেহ-পুষ্পের ঘ্রাণ আসিয়াছে, কিন্তু সকলই পার্শ্বে, পশ্চাতে, দূরে—সুদূরে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আছ শুধু তুমিই ধ্রুবতারা। ইহার কোনখানে থামিবার অবসর আমাদের নাই, কেন না তোমারই দিকে আমাদের গতি; ইহার কোন আকর্ষণে অভিভূত হইবার অধিকার আমাদের নাই, কেন না আমরা তোমারই তরে নির্দ্দিষ্ট।"

এমনই ভাবে মোস্‌লেম-জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যত সুর বাজিয়াছে, তাহার সকলগুলি মিলিয়া কেবলই এক ধ্বনিকেই সম্পূর্ণ করিয়াছে—"ইস্‌লাম।" মোস্‌-লেমের সকল মন্ত্রে, সকল কর্ম্মে প্রকাশ পাইয়াছে "ইস্‌লাম"---সেই আকুল আত্মনিবেদন, একান্ত আত্মসমর্পণ ও গভীরতম নির্ভর;---সেই প্রভুর বিধান

বরণ করিবার ঐকান্তিকী বাসনা; তাঁহার মধ্যে আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবার, সকল ভুলিবার তীব্রতম কামনা।

ইস্‌লামের ধারা

এই যে বিশ্বভুবন জীব, ও উদ্ভিদের নানা বর্ণচ্ছন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অসীম সুষমায় প্রকাশ পাইয়াছে—এই অনন্ত পশু, পতঙ্গ, তরু, বিহঙ্গ, এই শত ধর্ম্ম শত ভাষার মানুষ, এই অসীম বৈচিত্র্য-মূলে এক চরম ঐক্য-সূত্রের নিদর্শন আছে। জড়-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ শুধু সহানুভূতি নহে, জড় ও জীবের জীবনধারাও একই ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে। এই চেতনাহীন বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানুষের রস-রক্তের সম্বন্ধ আছে। কি এক গভীর সুমহান ঐক্যসূত্র যেন একই বিশাল ধরণীর মূলে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত হইয়া তাহাকে অন্তহীন বিচিত্র সুষমায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

এই যে মহাকাল দিন-রাত্রির পদক্ষেপ করিয়া তালে তালে গমন করিতেছে, এই যে নিয়মিত ঋতু-পর্য্যায় ও ফুল ও ফসলের প্রবাহ, এই সকলের মধ্যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য-পিপাসার পরিচয় আছে। বিশ্বব্যাপী জলধারা নানা পথ বহিয়া সাগরে পড়িতেছে; নির্ঝরিণী তরঙ্গিনীতে অঙ্গ মিশাইতেছে, তটিনীমালা তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সাগরে ছুটিতেছে; জীব তরু ও গিরি-

মরুর বিপুল বৈচিত্র্য বক্ষে লইয়া এই বিশাল ধরা ও নানা কক্ষচারী গ্রহরাজি নানা পথে একমাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; শত শত সূর্য্য লক্ষ লক্ষ গ্রহ লইয়া মহা-সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতেছে; অনন্ত অম্বরে অনন্ত জ্যোতিষ্ক ঐক্যতানে নৃত্য করিতে করিতে অনন্তের বন্দনা করিতেছে;—কোথায়ও কোন বিরোধ নাই, বৈষম্য নাই, সমস্ত একই আকর্ষণে আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশের মধ্যে ঐক্যসূত্র পরিষ্কাররূপে প্রকাশমান।

এই ঐক্যপিপাসা মানব-প্রকৃতিতেও সমভাবে বিদ্যমান আছে। সুতীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ মানুষের অন্তরের ধর্ম্ম, রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনকে অন্তহীন বৈচিত্র্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আপনাকে অন্যের মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে মানুষ কিছুতেই প্রস্তুত নহে। মানুষ বুঝিতে চায়, দেখিতে চায়, দেখাইতে চায়, সে স্বতন্ত্র, সে কিছু, তাহার আসনে সে গরীয়ান্ সম্রাট। তথাপি মানুষ ইহা করি-তেছে—স্বীয় সুখ-স্বার্থ সংহত করিয়া পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে; স্বাতন্ত্র্যমুখী আত্মবোধ অতিক্রম করিয়া সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র সৃজন করিতেছে; গিরি নদীর গণ্ডী কাটিয়া ধর্ম্মের মণ্ডলী গড়িতেছে। সাহিত্যের স্বাদ,

জ্ঞানের প্রসার, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও মনীষীর চিন্তা, দিন দিন মানুষ হইতে মানুষের দূরত্ব হ্রাস করিয়া আনিতেছে। নানা দেশের ও নানা ভাষার মানুষ নানা সংঘর্ষের মধ্য দিয়া একমাত্র বিশ্বমানবতার দিকে পদক্ষেপ করিতেছে। মানুষের মধ্যকার সমস্ত ভেদ ও বিসম্বাদ নষ্ট করিয়া এক মহা-রাজচ্ছত্রতলে মহামানবমণ্ডলী গড়িবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তরে চিরকাল জাগ্রত রহিয়াছে। এমন একদিন আসিবে, যখন সমস্ত স্বার্থদ্বন্দ্ব ও ধর্ম্মবিদ্বেষ ঘুচিয়া যাইবে, পাপ তাপের অবসান হইবে এবং এক ধর্ম্মের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়া মানুষ পৃথিবীতে প্রেমের শান্তিময় স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিবে। মানুষ চিরকাল ধরিয়া এই চরম ঐক্যের আশায় তাকাইয়া আছে।

গ্রহচক্রের আবর্ত্তন ও ধরণীর সর্ব্বত্র সলিল-সঞ্চরণের সহিত মানবদেহের রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমন্তের জড়ত্বভাব ও বসন্তের যৌবনানন্দ জীব ও বিশ্বদেহে একই প্রকারে প্রকাশিত হয়। তরুলতার প্রাণ আছে ইহাই মাত্র সত্য নয়, তাহাদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, পরিশ্রমের পর বিশ্রামের চিরন্তন নিয়মে মানুষের ন্যায় তাহারাও নিদ্রা যায়। অরুণের নবালোকে কেবলমাত্র জীবসকলই

নবোল্লাসে জাগিয়া উঠে না, বৃক্ষের পত্রে পত্রে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নবজীবনের হিল্লোল উঠে। নিশাগমে যে বিরাম আসে, তাহা কেবল জীবের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে না, সমস্ত জগতই সুপ্তি-মোহে অসাড় বলিয়া অনুমিত হয়। মেঘাচ্ছন্ন দিনে প্রকৃতির বিষণ্ণতা মানব-মনেও ছায়া বিস্তার করে—সজল মেঘের তলে মানুষের মনও কিসের ব্যাথায় উদাস হইয়া উঠে। যে কারণে ভূমিকম্প ও ঝঞ্ঝা-দুর্যোগে বিশ্ববক্ষে বিপ্লব বাধে, সেই একই কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে মানব-জগতেও বিপর্য্যয় ঘটে, একই রুদ্ধ-শক্তির সংক্ষোভে জড়প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি আলোড়িত হয়।

মূলে বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্য আছে—রস-রক্তের সম্বন্ধ আছে। এক সুমহান ঐক্যসূত্র বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির মূলে বিদ্যমান আছে। জীব ও জড়, চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থের মধ্যে ঐক্যের সনাতন মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। যাহা ভাবুকের অনুভূতির বস্তু ছিল, তাহা বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে। এই বিশ্ব চরম ও পরম একের বিকাশ ও বিলাস; তাহাকে লাভ করিবার জন্য বিচিত্র বিশ্ব মূলে মূলে ঐক্যের সাধনা করিতেছে।

প্রকৃতির মূলীভূত এই চরম ঐক্যসূত্রের সহিত ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূল ধারার চমৎকার মিলন আছে। প্রকৃতির প্রাণের মূলে যে মন্ত্রের রাগিণী বাজিতেছে, ইস্‌লাম ধর্ম্মে সেই ঐক্যের সুমহান ঝঙ্কার উঠিয়াছে। প্রকৃতির প্রাণগত এই চরম ঐক্যসূত্রই ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূল ধারা, ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রাণ ও সাধনা, তাহার সর্ব্বাবয়বে এই ঐক্যেরই অনুপ্রাণনা। যে চরম ও পরম এক জীব ও জড়, মূক ও মুখরকে একসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই বিরাট একত্বের সাধনাই ইস্‌লাম ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য।

কিন্তু মানুষের মধ্যে যেমন ঐক্য-লিপ্সা আছে, তেমনি স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিরও ক্রিয়া আছে। ঐক্য যেমন প্রকৃতির ধর্ম্ম, বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যও তেমনি স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রকৃতিতে এই উভয়েরই বিকাশ আছে। কিন্তু বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা ঐক্য গভীর ও বৃহত্তর; স্বাতন্ত্র্যে বিকাশ ও ব্যাপ্তি, কিন্তু ঐক্যে শক্তি; ঐক্য উৎসের মত বিচিত্রভাবে উৎসারিত হয়, নানা বর্ণে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। ঐক্যের বিকাশের জন্যই বৈচিত্র্য, ঐক্যের রস-সৃষ্টির জন্যই স্বাতন্ত্র্য। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব বহু, কিন্তু তাহাদের জীবন-রস মূলে। পুষ্পের পাঁপড়ি পৃথক পৃথক ফুটিয়া উঠে কেবল সমস্ত পুষ্পকে বিকশিত

করিবার জন্য। পৃথিবী আহ্নিক গতিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে কেবল একমাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত। ইস্‌লাম ধর্ম্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে, স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির সত্ত্বা আছে। বিধি-ব্যাখ্যানের বৈষম্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মেও নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমানের মধ্যে শিয়া সুন্নির সংঘর্ষ আছে, মজ্‌হাবের বিভেদ আছে। নামাজে কেহ নাভির উপরে হাত বাঁধে, কেহ বুকের উপরে রক্ষা করে। কেহ স্বর্গকে শারীর বলে, কেহ অবস্থার অনুভূতি-জ্ঞানে ধ্যানের মধ্যে মগ্ন হয়।

কিন্তু এই সমস্তই ইস্‌লামের বহির্বিকাশের বুদ্বুদ-মাত্র। ইস্‌লামের মূল মন্ত্র ঐক্য; হৃদয় যন্ত্র ও প্রাণের মন্ত্র ঐক্য; বিশাল অখণ্ড একত্বের সাধনা ইস্‌লাম ধর্ম্মের পরম ও চরম লক্ষ্য। “একমাত্র আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই” বলিয়া হজরত ঐক্যের যে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, ইস্‌লাম ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গে তাহারই অনুপ্রাণনা; সেই অদ্বিতীয় এককে লাভ করিবার জন্য ইস্‌লাম ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই ঐক্যের যোগ-সাধনা; মুসলমানের রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠানে ধর্ম্মে কর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে সেই মহা-ঐক্যের পরিবেদনা; মুসলমানের সকল ঘিরিয়া সকল ভেদিয়া সেই চরম ঐক্য-পিপাসা পরিষ্কাররূপে প্রকাশমানা।

আমরা মুসলমান সবাই সমান, আমাদের মধ্যে ভেদ নাই, বৈষম্য নাই, বিভিন্নতা নাই;—আমরা লক্ষ্য-মোক্ষ, জীবন-মরণ, সাধ-সাধনায় সমান। আমরা এক, নিবিড় অখণ্ড এক, অটুট অক্ষয় এক, বিশাল বিপুল এক, ঐক্যের আহ্নিক গতিতে আমরা অদ্বিতীয় এককে প্রদক্ষিণ করি। ইহাই মুসলমানের বাণী, ইহাই ইস্‌লামের সাধনা।

মুসলমানের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্। দেব নয়, দেবী নয়, পিতা নয়, পুত্র নয়; পীর নয়, পয়গম্বর নয়,—একমাত্র আল্লাহ্, সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে সকল মুসলমানের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্, অসীম অরূপ অতুলন আল্লাহ্—চিন্ময় অব্যয় অদ্বিতীয় আল্লাহ্। সে আল্লার অংশ নাই, অংশী নাই; সমান নাই, সন্তান নাই; বর্ণ নাই, বৈচিত্র্য নাই; তাহার কোন প্রতিনিধি নাই; সে একাই পরম, একাই চরম। সেই এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সেই অদ্বিতীয় এক ভিন্ন কোন মুসলমানের আর কোন উপাস্য নাই। তাহার চিন্তা-কল্পনা, বাক্য ব্যবহারে কোনরূপে আর কাহারও অস্তিত্ব নাই।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এক। ইহা প্রচার করিবার জন্য জনের পরে যীশু ও যীশুর পরে পলের আবির্ভাব হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারক উত্থিত হইয়া ইস্-

লামকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সমস্ত মুসলমান অখণ্ডভাবে একমাত্র হজরতের বাণীকেই বরণ করিয়া লইয়াছে, তাঁহাকেই একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; সমস্ত মুসলমান একমাত্র তাঁহারই পতাকা-মূলে সমবেত হইয়া একের বন্দনা করিয়াছে।

ইস্‌লামের ধর্ম্ম-পুস্তক একমাত্র কোর্‌আন। তাহাতে নূতন পুরাতনের বিভিন্নতা নাই। যুগে যুগে তাহা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয় নাই। ইস্‌লামের ভিন্ন ভিন্ন মজ্‌হাব বা সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-বিধির বিধান নাই। অতীত ও অনাগত পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমস্ত মুসলমানের জীবনের অবলম্বন একমাত্র কোর্‌-আন। জঙ্গলের নিগ্রো যে ভাষায় কোর্‌-আন পড়ে,—যে বাক্যে যে ছন্দে আল্লার বন্দনা করে, সুসভ্য ইংরেজ, আরবী, চীন ও বোর্ণী সেই একই ভাষায় কোর্‌-আন পড়ে, সেই একই প্রকারে আল্লার বন্দনা করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শীতাতপের তারতম্য থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানেই যাও দেখিবে, সর্ব্বত্র একই ভাবে দিনের আলো জ্বলে, জ্যোৎস্নার হাসি খেলে, সমীর-সলিলে প্রবাহ চলে। আল্লাহ্‌ নবী, ও কোর্‌-আন পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রত্যেক মুসলমানের অখণ্ড বন্দনা, সম্মান ও

শিক্ষার ধন। প্রত্যেকেই একমাত্র আল্লার দাস, একমাত্র নবীর শিষ্য ও একমাত্র কোর্‌-আনের বিধি-নিষেধের অধীন। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত,---ধর্ম্মের এই পঞ্চাঙ্গ দেশ, কাল ও ভাষা নির্বিবশেষে সমগ্র মুসলমানের অবশ্য পালনীয় সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। বন-জনপদে, মরু-পর্ব্বতে, হিম-ভূমে, দূর দ্বীপে---পৃথিবীর যেখানেই যখন যে মুসলমান অবস্থান করুক না কেন, সকলেই ধর্ম্মের এই সমস্ত বন্ধনে আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। সকলে একই প্রকারে আল্লার বন্দনা—ধর্ম্মানুষ্ঠান পালন করে, একই ঐক্য-শক্তির ক্রিয়ায় জীবন পথে অগ্রসর হয়।

এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান কেবলমাত্র নির্বিবশেষে পালন করে না। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ঐক্যের প্রেরণা ও প্রবাহ আছে।

মুসলমানের কলেমা ঐক্য-সাধনার বীজ-মন্ত্র। ‘একমাত্র আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই’, এই মহা-সত্য যে মর্ম্মে মর্ম্মে পোষণ করে, তাহার চক্ষু হইতে দ্বিত্বের যবনিকা খসিয়া পড়ে; সে সকল ভেদিয়া সকল ঘিরিয়া একের দ্যুতি দেখিতে পায়। সে এক ভিন্ন দুই দেখে না, একের রসে ডুবিয়া মজিয়া একের মধ্যে বিলীন হয়।

মুসলমানেরা এক সঙ্গে রমজানের উপবাস করে, এক

সময় আরম্ভ করিয়া এক সময়ে ভঙ্গ করে। রোজার সময় মুসলমানেরা প্রতিরাত্রে একত্র হইয়া একমাত্র আল্লার বন্দনা করে।

জাকাত সাম্যের সাক্ষাৎ সাধনা, মানুষের সহিত মানুষের একাত্মবোধের মাধুরীবৃষ্টি। জাকাত ধনীর ধনে নির্ধনের অধিকার দিয়া, ধনিগণের পুঞ্জীভূত ধনরাশি সমাজে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া সমাজে অখণ্ড সাম্যের সৃষ্টি করিয়াছে; সঞ্চয়ের তৃষ্ণা ও দারিদ্র্যের হাহাকার মিটাইয়া, ধন ও শ্রমের কলহ ঘুচাইয়া এক মহা-মানবতার ভিত্তি গড়িয়াছে। মানুষ মানুষের আত্মীয়, মানুষ মানুষের ভাই, জাকাতে এই মহা সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইস্‌লাম মানুষের ঐক্যবোধকে চমৎকাররূপে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

মুসলমানের উপাসনা, মণ্ডলীর উপাসনা ঐক্যের মহা-সাধনা। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া এক হইয়া নামাজ পড়ে, ছোট বড় এক হইয়া—অঙ্গে অঙ্গে এক হইয়া আত্মায় আত্মায় এক হইয়া—একমাত্র আল্লার বন্দনা করে,—এক হইয়া একত্বের সাধনা করে। প্রতি সপ্তাহে জুম্‌আর দিনে গ্রামে গ্রামে মস্‌জিদে আসিয়া সকল মুসলমান একত্র হয়; প্রতি বৎসরে দুইবারে প্রান্তরে প্রান্তরে মুসলমানেরা হাজারে হাজারে সমবেত হইয়া আল্লার মহিমা গায়।

জীবনে হজ-সাধনে সারাভুবনের মুসলমানে মুসলমানে মিলন হয় ; একের আহ্বানে এক দিনে এক ক্ষেত্রে বিশ্ব-মুসলমান একত্র হয় ; মুর, মিসরী, তুর্কী, তাতারী, ইরাণী, তুরাণী, কাবুলী, বাঙ্গালী সকল মুসলমান গিরি-দরির বাধা ভাঙ্গিয়া, মরু নদীর গণ্ডী কাটিয়া মহা পারাবার পার হইয়া ছুটিয়া আসে, উদার আকাশতলে মক্কার মহাপ্রান্তরে একত্রে মিশিয়া একাঙ্গ হইয়া একের বন্দনা করে। তাহারা বলে, "লাব্বা এক","লাব্বা এক", হে এক ! অদ্বিতীয় এক ! আমরা আছি, তোমার সকাশে উপস্থিত আছি ; মিথ্যা করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, ভেদের রেখা গোপন করিয়া তোমার কাছে আসি নাই ;—বহুত্বের অশুদ্ধি লইয়া আমরা তোমার পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হই নাই ,—বিভিন্ন-রূপে আমরা তোমাকে লাভ করিতে আসি নাই। হে এক ! আমরা একত্র হইয়া, একাঙ্গ হইয়া, এক সাজে সজ্জিত ও এক রবে মুখর হইয়া একত্বের শুদ্ধি লইয়া তোমার সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। হে প্রভু! তুমি এক, তাই তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমরা নিঃশেষে এক হইয়া আসিয়াছি। আমরা এক, নিবিড় অখণ্ড এক, বিশাল বিপুল এক, আত্মায় আত্মায় এক,—আমরা ঐক্যের আহ্নিক গতিতে একমাত্র তোমাকে প্রদক্ষিণ করি।

প্রকৃতির মূলীভূত ঐক্যশক্তির ন্যায় ইস্‌লামের এই ঐক্যধারা দেশ কাল গিরি মরু ও শাসনের বাধা অতিক্রম করিয়া সমগ্র মুসলমানের জীবনের মধ্যে অবিচ্ছেদে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। শত শত বৎসরের আবর্ত্তন, সভ্যতার পরিবর্ত্তন, চিন্তার বিকাশ ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইস্‌-লামের বিধি-ব্যবস্থা অণুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। পাথরের অচল দেওয়ালের মত নহে, প্রকৃতির নিত্য-নিয়মের মত ইস্‌লামের বিধান চিরকাল ধরিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান আছে।

বস্তুতঃ ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বীর চিত্ত-বদনে একত্বের নিদর্শন আছে। মুসলমানের আচার ব্যবহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, তাহার গৃহ-সমাজ, রাষ্ট্র-জীবনে ঐক্যের পরিষ্কার পরিচয় আছে। ইস্‌লামের ঐক্য-চিহ্ন ফ্রিম্যাসনের চিহ্ন অপেক্ষা পরিষ্কার, ইস্‌লামের ঐক্যধ্বনি তটিনীর কুলুধ্বনির মত চিরন্তন। ‘আল্লাহো-আকবর’ রবে সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত সমস্ত মুসলমান কম্পিত হয়। ‘আস্‌সালামো আলায়কুম’ বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে মুসল-মানের সহিত মুসলমানের আত্মীয়তার সাক্ষ্য দেয়; এক মুহূর্ত্তে জুলু-মুসলমান তুর্কী-মুসলমানকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার অধিকারী হয়।

এইরূপে ধর্ম্মগত ঐক্য হইতে মুসলমানের বিশ্বজনীন বিরাট জাতীয়তার উদ্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান এক মহাজাতি—এক বৃহৎ পরিবার—এক বিশাল দেহ; তাহার একাঙ্গের বেদনা সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের প্রাণে প্রাণে এই জাতীয়তার অনুভূতি আছে; তাহার চিন্তা-প্রার্থনায়, আশা-কামনায় এই জাতীয়তার প্রকাশ আছে। কোর্-আন শরীফে আল্লাহ্-তাআলা ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুসলমানদিগকে ভিন্ন নামে সম্বোধন করেন নাই; তাঁহার আহ্বানে ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মুর্খ ও সভ্য-অসভ্যের বৈষম্য রাখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "হে সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসিগণ!" এক জন নহে, দশ জন নহে, আরব বা ইরাণী নহে, ইংরাজ বা বাঙ্গালী নহে, প্রাচীন বা নবীন নহে,—যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে ও সৎ হইয়াছে, তাহারা সকলেই। কোর্-আন শরীফে কোথায়ও ব্যক্তিগত আহ্বান নাই; যেখানে আল্লার আহ্বান আছে, সেখানেই তিনি সমস্ত মুসলমানকে অবিচ্ছেদে এক করিয়া ডাক দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মুসলমানের প্রার্থনাও ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে। তাহা মণ্ডলীর প্রার্থনা—সমগ্রের প্রার্থনা। প্রত্যেক মুসলমান একই মহামণ্ডলীর অঙ্গরূপে আরাধনা করে।

'আমি তোমাকে বন্দনা করি', ইস্‌লামের ধর্ম্মানুষ্ঠানে এমন ব্যক্তিগত বন্দনার বিধান নাই। মুসলমানেরা বলে, "হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই আরাধনা করি; আমরা তোমারই নিকটে সাহায্য চাই।" শুধু বন্দনা বা প্রার্থনা নহে, মুসলমানের কামনাও জাতীয় কামনা,—মহা জাতীয়তার অগ্নিশিখা—"আমাদিগকে ক্ষমা কর, 'আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, 'তার পর হে আমাদের প্রভু, অবিশ্বাসী (বিদ্রোহী) জাতিদের উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত কর।" পতনে প্রার্থনায়, উত্থানে জিগীষায় মুসলমান এক নিবিড়রূপে এক—মহাজাতীয়তার তাড়িত-প্রবাহে বিদ্ধ ও জীবন্ত এক। সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান অবিচ্ছেদে একাত্ম ও এক জাতি।

দেশ, ভাষা ও শাসনের বৈষম্য মুসলমানদিগকে পৃথক্ করিতে সমর্থ নহে; নদী, মরু ও পর্ব্বত মুসলমানদিগের মধ্যে ভেদ-বৈষম্যের রেখা টানিতে সক্ষম নহে। ইথারের সর্ব্বত্র যেমন আলোক-তরঙ্গের কম্পন হয়, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের প্রাণ তেমনই একই প্রেরণা ও আকর্ষণে স্পন্দিত হয়। মুসলমানগণের মধ্যে পৃথক পৃথক দেশাত্মবোধের স্ফূর্ত্তি নাই, তাহারা দেশভেদে অবিচ্ছেদে এক। তাহারা তুরস্কে, পারস্যে, আরবে, ভারতে

যেখানেই বাস করুক না কেন, সর্ব্বত্র সর্ব্বাগ্রে মুসলমান, এক রক্তের রক্ত, এক অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, এক জাতির অংশ মুসলমান। সর্ব্বত্র 'আল্লাহো-আকবর' তাহার বাণী, চন্দ্র তাহার কেতু, কাবা তাহার কেন্দ্র।

এই জন্যই পৃথিবীর যখন যে জাতি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই জাতিই সর্ব্বপ্রকারে মুসলমান হইয়াছে; তাহার পূর্ব্বতন আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হালাকু খাঁর অধীনে মোগল-জাতি মোস্‌লেম ও মোস্‌লেম-সভ্যতার ধ্বংস সাধন করিতে করিতে টাইগ্রিস নদীর তীরে দাঁড়াইয়া যখন বলিয়া ফেলিল, "লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্—মোহাম্মদোর রসুলুল্লাহ্" তখন হইতে তাহাদের রং চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল; আরবদিগের সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া এক হইয়া গেল যে, তাহাদের পূর্ব্বতন সভ্যতার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিল না।

এই মূলীভূত ঐক্য-ক্রিয়ার ফলে মুসলমানের অসামান্য সাম্যের উৎপত্তি। যে কারণে মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই, সেই কারণেই মুসলমানের মধ্যে বৈষম্য নাই। জাতীয়তার প্রসারেই মানবতার উৎপত্তি। ঐক্যের ক্রিয়ায়—একত্বের সাধনায় ইস্‌লামের দৃষ্টি শুধু এক-

জাতীয়তাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই, তাহা আরও বৃহত্তর হইয়া এক-মানবতার সৃষ্টি করিয়াছে; জাতীয়তার স্রোতধারা মানবতার সাগর-বেলা চুম্বন করিয়া অসীমের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। একত্বের যে সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া মুসলমান উচ্চারণ করিয়াছে, "নাই নাই, আল্লাহ্ ছাড়া আর উপাস্য নাই," সেই উচ্চগ্রামে দাঁড়াইয়া মুসলমানের বাণী,—"নিশ্চয় সমস্ত মুসলমান ভাই-ভাই" —তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই—ভেদ নাই। তাহারা শুধু একই জাতি নহে, একই মানুষ—একই প্রাণের ভাই।—"আল্ মোস্‌লেমো আখোল মোস্‌লেমে"। ইস-লামে রক্ত অর্থ পদ বর্ণের অণুমাত্র বৈষম্য নাই। ইস্‌লামে ক্রীতদাস মহামান্য সম্রাট-তনয়ার পাণিগ্রহণ করে ও সিংহাসনের অধিকারী হয়। সম্রাটের সিংহাসন নহে, সম্রাটের সম্ভ্রমও তাহার চরণ-মূলে অঞ্জলি হয়। ক্রীতদাস জায়েদ পয়গম্বরের আত্মীয়, আর বেলাল তাঁহার প্রেমা-স্পদ সহচর। তপ্ত বালুকাশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া দুর্ভাগ্য ক্র।তদাস নিখিল মুসলমানের প্রেম-সম্মানের স্বর্ণাসনে সমাসীন সম্রাট। মহামান্য খলিফা ও অধম ক্রীতদাস একই মানবতার উদার সমতলে সমসূত্রে দণ্ডায়-মান। উভয়েই তাহারা মানুষ;—উষ্ট্রারোহণেব অধিকার

উভয়েরই তাহাদের সমান। সেবাই দাসের সর্ব্বস্ব নহে, সেবা-গ্রহণেরও তাহার অধিকার আছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মে পথের মজুর ক্রোড়পতির সহিত একপাত্রে ভোজন করে; কড়ির কাঙ্গাল জীর্ণবস্ত্র স্কন্ধে জড়াইয়া মণিমণ্ডিত সম্রাটের সহিত অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া আল্লার বন্দনা করে। আল্লার আকাশ-বাতাসে, ভূমি-বৃষ্টি রৌদ্র-জলে যেমন প্রতি মানুষের অধিকার আছে, ইস্‌লামের সমুদয় আচার ও অধিকারেও তেমন প্রত্যেক মুসলমানের অবিচল অধিকার আছে।

এইরূপে ইস্‌লাম ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গে এক চরম ঐক্য-স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব জীবন-রসে পরিপূর্ণ করিয়াছে। প্রকৃতি নির্ব্বাকভাবে যে মন্ত্রের সাধনা করিতেছে, যে সঙ্গীত-সমন্বয় নিখিল ভুবনের মূলে বিদ্য-মান থাকিয়া এই বিপুল বিচিত্র জগত-যন্ত্র অনায়াসে চালনা করিতেছে, সেই পরম ঐক্য ইস্‌লাম ধর্ম্মে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

রমজান

জোৎস্নাময়ী সুপ্তা ধরণীর অর্দ্ধম্লান মনোহর মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে, গভীর নিশীথে মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া ছায়াময়, আলোময় বিরাট বিশ্ব-ছবি দেখিবার যাহার সৌভাগ্য হইয়াছে, সেই জানে রমজান কেমন। এক দিকে ভুবন ভরিয়া উল্লাসময় অমল ধবল কৌমুদি-হাস্য, অপর দিকে তন্দ্রামগ্ন বিশ্বের নীরব নিস্পন্দ ধ্যানমূর্ত্তি;—গাম্ভীর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের, স্থৈর্য্যের সহিত উল্লাসের, মৌনতার সহিত আনন্দের এমন অপরূপ মেশামিশি দেখিয়াছ কি?—পত্র-পল্লবে সাড়া নাই, বায়ুর চাঞ্চল্য নাই, শব্দের কোলাহল নাই,—সমস্ত স্থির,—জগৎ ধ্যানমগ্ন—তন্ময়। কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া হাস্যের কি অপার লহরী-লীলা, ভুবনের অঙ্গে অঙ্গে পুলকের কি বিপুল উচ্ছ্বাস! এই আনন্দময় বিরাট-মূর্ত্তি,—এই গভীর গম্ভীর মধুর ভাব—ইহাই রমজানের স্বরূপ। ইহার এক দিকে ভক্তিময় ধর্ম্মভাবের বিরাট স্থৈর্য্য, অপর দিকে কল্যাণময় উৎসবের অপার উল্লাস;—ইহার এক দিকে সাধনা, অপর দিকে করুণা;—এক দিকে গভীর শান্তি, অপর দিকে মধুর প্রীতি।

এই যে মোস্‌লেম-জগৎ ব্যাপিয়া আনন্দের কলধ্বনি উঠিতেছে, ইহা কিসের উল্লাস? বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া রমজানের আবাহনে সমগ্র মুসলমান কেন এমন করিয়া মাতিয়া উঠে? ইহার বিদায়-ব্যথায় ঈদের উৎসব 'হায় হাৎ! হায় হাতে'র * করুণ সুরে কাঁদিয়া উঠে কেন?—

রমজান বিশ্বপাতার পরিপূর্ণ মহিমার আভাস,—মঙ্গলময়ের পরম দান,—তাঁহার কল্যাণ ও করুণার ছায়া। শুদ্ধি ও শান্তি, সংযম ও সাধনা, দান ও পূণ্য, প্রেম ও কল্যাণ, আনন্দ ও উৎসব ইহাকে এমন ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে, মুসলমানের সমগ্র জীবন-ব্যাপারের মধ্যে তাহার আর তুলনা মিলে না।

ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রের জয়টীকা পরিয়া রমজানের প্রথম সন্ধ্যা যখন জগতের উপর নামিয়া আসে, তখন যেমন গৃহে গৃহে দীপালোকের সহিত পুলকের আলোক জ্বলিয়া উঠে, তেমনই ধীরে ধীরে মুসলমানের ভিতর ও বাহিরের সকল শব্দ কোলাহল নিবিয়া যাইতে থাকে,—রজনীর

* "হায় হাৎ! হায় হাৎ!"—হায়! হায়! ঈদের নামাজান্তে রমজানের বিদায় উপলক্ষে যে খেদপূর্ণ খোত্‌বা (Sermon) পঠিত হয়, ইহা তাহার একটি বাণী।

নীরবতার সহিত এক গম্ভীর বিরাট সত্ত্বার অনুভূতিতে মুসলমানের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই "সেই রমজান মাস যাহাতে মানববৃন্দের পথ-প্রদর্শক এবং সৎপথ ও মীমাংসার উচ্চ নিদর্শন কোর্-আন অবতীর্ণ হইয়াছে।" এই সেই রমজান যাহার মধ্যে প্রভুর প্রথম দান মানুষকে সার্থক ও সুন্দর করিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহনের শেষে স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার মত ইহারই মধ্যে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছে কোর্-আনের মহা-বাণী, গভীর অন্ধকারে শান্তি ও মুক্তির প্রথম জ্যোতিঃ-বিভাস। প্রভু জানাইয়াছেন, হে মানুষ! আমি আছি। আমি অনন্ত অব্যয় চিন্ময় অরূপ একেশ্বর; আমিই তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা; আমিই তোমার পালক; আমাকে জান, 'একরা বেস্মে রব্বেকা'—আমারই নামে পাঠ কর। তাই মুসলমানের মন-বীণায় রমজান এমন মহান, বিরাট সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছে। তাই পাঠ করিবার—বোধ করিবার—ধারণা করিবার কি বিপুল অন্তর্লীন গভীর আয়োজন! এই ভক্তি-বুদ্ধ ভাব-গভীর রমজান —সুপ্ত স্তব্ধ ধ্যানমগ্ন বিশ্ব-ছবি।—মোস্লেমের জীবন-সাধনার প্রতিরূপ। ইহারই মধ্যে 'লাইলাতুল কদর'—মুক্তির মহালোকে ভাস্বর, কল্যাণের পূর্ণানন্দময় গৌরব-

রজনী। তাই সেই অলিখিত পরাৎপরকে পাঠ করিবার জন্য, অনন্ত মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিবার নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে ত্রিশ দিবসের রোজা-ব্রত—গভীর গম্ভীর সাধনা,—মোস্‌লেমের নীরব নিস্পন্দ ধ্যান-মূর্ত্তি। তাই রমজানে মুসলমানের সাংসারিক জীবনের শত-দিক-প্রসারিণী গতি রুদ্ধ, স্বার্থের অনন্ত কল-কোলাহল স্তব্ধ; কামনার শত ভঙ্গীময় চাঞ্চল্য স্থির। সুখের আবেশে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে না, স্বাদের লালসায় রসনা সঞ্চালিত হয় না, রূপ-মোহে নয়ন-পল্লব উৎসারিত হয় না। সংযম, সকল ভোগ, সকল লালসা, সকল ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম উচ্ছ্বাস সংহত ও স্তব্ধ করিয়া দেয়;—উপবাসক্লিষ্ট শুদ্ধ প্রবুদ্ধ মন বিরাটের ধ্যানে তন্ময় হইয়া উঠে।

এই খানেই মাস-ব্যাপী দীর্ঘ উপবাসের সার্থকতা। এই যে প্রতি দিনের কঠোর সংযম, প্রতি নিশির জাগরণ,—ধ্যান ও প্রার্থনা চির-অব্যক্ত গৌরব-রজনীর অনন্ত পুণ্য লাভ করিবার জন্য চির-গুপ্ত চির-সত্য মহান আল্লার মুক্তিময় কল্যাণময় জ্যোতির অমৃত-তরঙ্গে ডুবিবার নিমিত্ত কি গৌরবময় এ সাধনা! প্রভু যেন বলিতেছেন, আমি গুপ্ত হইয়া আছি, আমাকে খোঁজ। নিজেকে স্তব্ধ সংহৃত করিয়া, একাগ্রমনে আমাকে অন্বেষণ কর।

এই এক মাসের জন্য তোমার যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, যত কিছু সাধের, প্রাণের জিনিষ আছে, সকল ত্যাগ করিয়া শুধু আমারই কাছে এস;—শুদ্ধ হইয়া, শান্ত হইয়া আমাকেই চাও,—'লাইলাতুল কদরে'—গৌরব-রজনীতে যে অনন্ত কল্যাণ আমি গোপন করিয়া রাখিয়াছি তাহা তুমি পাইবে।

এই সিদ্ধি, এই বিজয়, এই গৌরব এক দিনে লাভ করা যাইতে পারে না। অবিশ্বাসী ধর্ম্মদ্রোহী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে, উপবাসের কোন আবশ্যকতা নাই, অনাহারে শরীর ধ্বংস করিলে মুক্তি মিলে না, মনের পবিত্রতা আবশ্যক! বিজ্ঞান-বিদের মত, উপবাসে শরীরের গ্লানি কাটিয়া যায়, জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়, মন সতেজ হইয়া উঠে। কিন্তু একাদিক্রমে ত্রিশ দিন ধরিয়া এত দীর্ঘ উপবাস অনিষ্টকর, ইহাতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অজ্ঞান জড়বাদী ইহারা, রোজার মহিমা কি বুঝিবে? আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গুরু পাশ্চাত্য সমাজের বহু পণ্ডিত দীর্ঘ উপবাসের সহায়তায় বহু দিনের রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উপবাসের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। অনেক বিদ্বান চিররুগ্ন ব্যক্তি উপবাস ও সামান্য আহার অবলম্বনে নবজীবন লাভ করিয়া উপবাসের মহিমা

ঘোষণা করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে কয়েক দিনের উপ-বাসেই বুঝিতে পারা যায়, বহুদিনের অজীর্ণ খাদ্যের গুরুভার হইতে মুক্ত হইয়া পাকস্থলী স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইয়াছে, শরীর লঘু হইয়াছে, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই দৈহিক উন্নতির সহিত রোজার সম্বন্ধ কি? যে মহিমময় রোজাকে ঘিরিয়া শত সাধু, শত সাধকের প্রাণের মন্ত্র গুঞ্জরিত হইয়াছে, ভোগায়তন জড় দেহের উন্নতিমাত্র তাহার লক্ষ্য নহে;—আত্মার বিকাশ তাহার লক্ষ্য,—ধর্ম্ম-জীবন লাভই তাহার সাধনা। এই রম-জানের মধ্যে আত্মার স্বর্গীয় খাদ্য আসিয়াছে, দেহের খাদ্যে তাই আমাদের স্পৃহা নাই। এই মাসে বিভু-বাণীর অমৃত-বারি বিতরিত হইয়াছে,—দেহ সঙ্কুচিত করিয়া আত্মা তাহা পান করিবার জন্য আকুল। দেহের প্রতি উপেক্ষা এই গৌরবময়ী স্মৃতিরই সমাদর। তাই এই শুদ্ধ-শান্ত উপবাস।

কিন্তু দেহ সঙ্কুচিত করিয়া আত্মা বিকসিত করিবার এই যে আয়োজন, ইহা এক দিন বা দুই দিন উপবাসে পূর্ণ হইতে পারে না। মন বিনা সাধনায় পবিত্র হয় না। গৌরব-রজনীর মুক্তি ও কল্যাণ লাভ এক দিনের সাধনায় সম্ভবপর নহে। এই স্বার্থ-কামনাময় সংসার তাহার

বিচিত্র রূপ ও রসে পূর্ণ হইয়া কত বন্ধনে আমাদিগকে জড়াইয়া রাখিয়াছে ! ইহার মোহের লেশ নাই, আবেশের শেষ নাই। কামনা-তৃপ্তি ও স্বার্থ-সিদ্ধি মানুষের নিশিদিনের সংগ্রাম। পদ, ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের জন্য মানুষের প্রাণ পলকে পলকে আকুল। রজতের রিনি-রিনি ধ্বনিতে কি অমৃত ! দুগ্ধ-ফেননিভ কোমল শয্যার কি আবেশ। সূক্ষ্ম সুন্দর পরিচ্ছদে কি উল্লাস ; রমণীর রূপ ও যৌবনের কি মাধুরী !—মানুষ এই সমস্তের জন্য উন্মাদ। এই ভোগ-সাধনা ও স্বার্থ-সংগ্রামে মানুষের নির্ম্মল প্রাণ কলুষ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে ; পবিত্রতা লালসার মেঘময়ী অমানিশায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাস। প্রাণে কত কুটিলতা, কত কুমন্ত্রণা। প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার ভূমি ও ক্ষমতা হরণ করিবার জন্য কত-জন কৌশলের উপর কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছে, রূপভোগের জন্য কত জন দিকে দিকে পিশাচ হইয়া ফিরিতেছে, কত অমৃতের সন্তান অর্থ-লালসায় পশুর মত ঘৃণিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, প্রতি দিন কত মিথ্যা, কত কুহক, কত নীচতায় জীবন ভরিয়া উঠিতেছে। কোথা ধর্ম্ম, কোথা পূণ্য, কোথা প্রেম, কোথা পবিত্রতা !

মায়া-মুগ্ধ, লালসা-কলুষিত মানব প্রতি দিন সংসার-সাগরে কীটের মত উঠিতেছে, ডুবিতেছে। তাহার গৌরবময় জীবন, তাহার মহতী সত্ত্বা তাহার নিকট অর্থহীন প্রলাপ। সে জানে না, ভাবে না, কত উচ্চ মহান সে, আর কত নিম্নে ডুবিয়াছে। সংসারের মানুষ যদি চিন্তা করে গভীর রাত্রিতে নীরবে নির্জ্জনে মনের গুপ্ত পুর খুলিয়া দর্শন করে, জীবনের প্রতি দিনের বাসনা ও কর্ম্মসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কত ক্ষুদ্র তার জীবন,—কি নীচতা, কি অপবিত্রতায় তাহার অন্তর পরিপূর্ণ। অসম্ভব—ইহা অসম্ভব। ঘন বনাচ্ছাদিত পল্লীর রুদ্ধদ্বার নিভৃত কুটীরে শয়ন করিয়া পর্ব্বতের সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন অসম্ভব; রাত্রিদিন কোমল মসৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া তন্দ্রাবেশে মগ্ন থাকিলে সুদৃঢ় বলিষ্ঠ বাহু লাভের বাসনা বাতুলতা;—সংসারের অনন্ত স্বার্থ ও কামনায় মগ্ন থাকিয়া মনের পবিত্রতা লাভ দুঃস্বপ্ন। প্রতি মুহূর্ত্তে অর্থের কামনা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব, স্বার্থ সাধনের জন্য পলে পলে মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় লইব, সুরসাল মধুর খাদ্যে ও দৈহিক ভোগে ইন্দ্রিয়গ্রাম পুষ্ট ও উল্লাসময় করিব, আর সঙ্গে সঙ্গে মন স্ফটিকের মত উজ্জ্বল ও

নির্ম্মল হইতে থাকিবে, স্বর্গীয় ভাবসকল অন্তরে তরঙ্গায়িত হইবে, ইহা কি কখনও সম্ভব? সংসারের মানুষ পঙ্কিল জড়দেহের সেবায় তন্ময়, মনের উন্নতি করিবার তাহার অবসর নাই; স্বার্থ-চিন্তা ও ভোগ-লালসায় সে চির-মগ্ন, আত্মার গরিমা ও ঐশী ভাবের পুলক বোধ করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। সে মুগ্ধ, মূর্চ্ছিত এবং আচ্ছন্ন।

তাই এই জড়-মায়ায় মুগ্ধ, মূর্চ্ছিত ও বিস্মৃত মানুষকে সচেতন ও আত্মস্থ করিবার জন্য, পতিত কলুষিত মানবকে মনুষ্যত্বের পুলক ও পবিত্রতায় উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া রমজান আসে। এই গৌরবময় রমজান ঐশী শক্তির প্রেরণা, ধর্ম্ম ও চৈতন্যের দিকে আল্লার অনন্ত আহ্বান-বাণী। বর্ষের পর বর্ষ এই নিত্য সত্য চিরন্তন মহাবাণী মানব-মণ্ডলে নীরবে, গভীরে, গম্ভীরে ঝঙ্কৃত হইতেছে। রমজান ডাকিয়া বলিতেছে, উঠ, হে মুগ্ধ, বিস্মৃত মানুষ! জড়-মায়া হইতে জাগ্রত হও। হে সুপ্ত! শুন, তুমি ওই ভোগ-সর্ব্বস্ব দেহ নও; দেহের ক্ষুধা তোমার ক্ষুধা নয়; ঐ পঙ্কিল দেহের লালসা-কামনা, ঐ শত কুটিলতা, হিংসা-দ্বেষ, ঐ ঘৃণা ঐ নীচতা, ও সকল তুমি নও।—তুমি আত্মা—প্রাণময়, জ্ঞানময়,

চৈতন্যময় আত্মা, উহাদের বহু উর্দ্ধে তোমার স্থান। অনন্ত কল্যাণময় চিন্ময় আল্লার ধ্যান ও চিন্তায়, প্রেম ও সেবায় যে অম্লান আনন্দামৃত সঞ্চিত আছে, তাহাই তোমার খাদ্য। হে বিস্মৃত! সুপ্তি হইতে উঠ, জড়দেহ জয় কর, লালসার বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল। শুদ্ধি, শান্তি ও পুণ্যের পুলক,—মুক্তির অমৃত-ধারা পান করিবার জন্য আপন রূপে, আপন গৌরবে ফুটিয়া উঠ।

নিশ্চয় এই আহ্বান, এই মহা প্রেরণা লইয়া রমজান আগমন করে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত মোস্‌লেমের প্রাণে প্রাণে এই প্রেরণা সঞ্চালিত হয়, এ আহ্বানে মুগ্ধ মূর্চ্ছিত আত্মা সাড়া দেয়, চৈতন্যের সাধনায় সমগ্র মোস্‌লেম উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

অষ্টম বর্ষের রোজাদার শিশুর উপবাস ম্লান শান্তোজ্জ্বল মুখের প্রতি চাহিয়া দেখ, চির-মদ্যপায়ী উপবাসী যুবকের সংযত ছবি দর্শন কর, রমজানের মধ্যে চিরদিনের ভয়-ভক্তিহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের নামাজানুরাগ চিন্তা কর, আর বল, রমজান সত্য সত্যই পুণ্য ও চৈতন্যের আহ্বান কি না—ঐশী শক্তির প্রেরণা কি না। এমন পাপী নাই, রমজানের মধ্যে পাপ করিতে যাহার অন্তর একটু—একটু শিহরিয়া উঠে না; এমন মিথ্যাবাদী প্রতারক নাই,

রমজানের মধ্যে মিথ্যা বলিতে যাহার মুখের শিরা মুহূর্ত্তমাত্রও কুঞ্চিত হয় না; অপহরণশীল সিদ্ধ হস্ত অন্যায় ভাবে ধনাহরণে একটিবারও সঙ্কুচিত হয় না। যখন দেখিতে পাই, দিবসের মধ্যে ভ্রমেও যাহারা নামাজের কথা স্মরণ করে না, স্বার্থের জন্য পিশাচ সাজিতে যাহারা কোন দিন কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহারাও রোজা রাখে নাই স্বীকার করিতে লজ্জায় মলিন হইয়া পড়ে, তখন মনে হয় এই ভক্তি-শুদ্ধ, ভাব-গভীর রমজান বিধাতার কি অপরূপ আহ্বান-বাণী! প্রাণের ঐ সঙ্কোচ, ঐ কম্পন, ঐ শিহরণ, চৈতন্যের স্পর্শ, ঐশী শক্তির প্রেরণা। প্রত্যেক মুসলমান উহা অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু এই অনুভূতিতে যে উদ্বুদ্ধ হয় না, জড়দেহ জয় করিবার জন্য সংযম-সাধনায় প্রবৃত্ত হয় না, তাহার আশা নাই। জড়দেহ তাহাকে শোচনীয়রূপে গ্রাস করিয়াছে, শয়তান তাহাকে চির-দাসত্বে বন্দী করিয়াছে। এই জড়দেহের ভোগ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, লালসা পূরণ, ইহাই তাহার সর্ব্বস্ব। এই জড়দেহের বাহিরে তাহার আর কোন আশা নাই; তাহার ভবিষ্যৎ হতাশাময়, যাতনাময় অনন্ত অন্ধকার। তাহার সকল সাধ, সেবা ও পূজার সামগ্রী এই পতনশীল জড়দেহের যখন

অবসান হইবে, তখন দাঁড়াইবার একটু অবলম্বনও সে পাইবে না।

তাই শুদ্ধ, বুদ্ধ, পবিত্র হইয়া আত্মা বিকশিত করিবার জন্য এই ত্রিশ দিনের রোজা ব্রত—জড় জয়ের এই গভীর গম্ভীর সাধনা। অনর্থক নহে, অন্যায় অতিরিক্ত নহে, ধর্ম্ম-প্রচারকের শূন্য কল্পনা নহে, প্রতি বর্ষে দীর্ঘ ত্রিশ দিন ধরিয়া এই উপবাস, এই সংযম, এই অনাসক্তি, জড়ের ঐন্দ্রজালিক আবেশ, শয়তানের কুহক ধ্বংস করিয়া আত্মস্থ হইবার জন্য ইহার আবশ্যকতা অতি সত্য, অতি মহৎ। পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব লাভের পরম প্রয়োজনীয় সুন্দর এ সাধনা। উপবাস ও কঠোরতা বিহনে এই দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়-সমৃদ্ধ জড়দেহ সঙ্কুচিত হয় না। দুই দিনের উপবাসে জড়ের মায়া কাটে না। এ কুহক কাটাইবার জন্য সাধনারই প্রয়োজন; এই দুর্জ্জয় ক্রোধ, এই পৈশাচিক হিংসা, এই তীব্র কাম-লালসা নষ্ট করিবার জন্য দীর্ঘ সংযমই আবশ্যক। দীর্ঘ উপবাসের ফলে, পোষণাভাবে দেহ যতই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে, ভোগ-সুখের আবেশ ততই কমিয়া আসে, ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ততই ভাটা পড়ে। উপবাস-ক্লিষ্ট মনে উগ্র, তীব্র লালসার সঞ্চার হয় না,—দুর্জ্জয় ক্রোধ, দুর্জ্জয় কাম,

দুর্জ্জয় হিংসার অবসর ঘটে না। জীবনের সর্ব্ব চাঞ্চল্য স্থির হইয়া আসে। নির্জ্জীব স্থবির দেহে, ক্ষুণ্ণ ক্ষিণ্ণ মনে জাগে উদ্দাম ঝঞ্ঝাময়ী ঘোরা ভীমা রজনীর অবসানে উষার শুভ্র শ্বেত রেখার মত শান্তি, প্রীতি ও পবিত্রতা। সূর্য্যের পানে নয়ন মেলিয়া আত্মার মুদ্রিত কোরক ধীরে ফুটে ; জড়-মায়ার আঁধার ধীরে কাটে ; ঐশী ভাবের পুলক সোনার তপন-কিরণের মত জীবনে ছড়াইয়া পড়ে।

ইহা এক দৃশ্য—রমজানের ভাব-গম্ভীর মহিম-দৃশ্য—সুপ্ত স্তব্ধ বিশ্ব-ছবি—ধ্যানমগ্ন সাধক-মূর্ত্তি। এখন ইহার অন্য দৃশ্য দেখাইব. রমজানের কোমল করুণ, মধুর মূর্ত্তি আঁকিব,—ছায়ার সহিত জ্যোৎস্না মিশাইব।

এই সেই রমজান—শুভদ, বরদ, সাধের রমজান। তৃষিত কণ্ঠে এ শান্ত স্নিগ্ধ সল্‌সবিল-ধারা *, দগ্ধ অঙ্গে সর্ব্বজ্বালানাশক অমৃত-প্রলেপ। এ দরিদ্রের বন্ধু, ব্যথিতের সান্ত্বনা। অনাথ, আতুর, অভাগা কাঙ্গাল সারা বৎসর শীর্ণ বাহুযুগল. তুলিয়া ইহাকেই আবাহন করিয়াছে। শত শত নিঃসম্বল গৃহী সারা বৎসর ইহারই আশায় বুক বাঁধিয়াছে। রমজানে রহ্‌মান (দয়াময়) মানব-মণ্ডলে স্বীয় স্নেহ ও করুণা নিঃশেষে

* সল্‌সবিল—স্বর্গের সুস্বাদু বারির প্রস্রবণ।

ঢালিয়া দিয়াছেন,—তাই মুসলমানের প্রাণে প্রাণে পুণ্য ও প্রীতির প্রবাহ সকল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। যে অভাগা সারাবৎসর প্রতিদিন এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে হাহাকার করিয়া বেড়াইয়াছে, আজ অফুরন্ত খাদ্য-ভাণ্ডার তাহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত, তাহার উদরজ্বালা শান্ত হইয়াছে। যে ব্যথিত সারাবৎসর এক বিন্দু দয়ার জন্য কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছে, সে আজ করুণার অজস্র ধারে স্নাত ও স্নিগ্ধ; যে অভাগী শত-ছিন্ন মলিন কন্থায় ক্ষীণ দেহটুকু ঢাকিতে না পারিয়া মরমে মরিয়া ছিল, সে নববস্ত্র লাভ করিয়াছে; যে দরিদ্র গৃহস্থ শত চেষ্টা করিয়াও পরিবারের অভাব দূর করিতে পারে নাই, সে আজ সার্ব্বজনীন দয়া-স্রোতে শূন্য ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া লইতেছে। বিভুর ভাণ্ডার হইতে আজ দিকে দিকে ভারে ভারে অন্ন-বস্ত্র রত্ন-কাঞ্চন বিতরিত হইতেছে, 'হাওজে কওসরে'র * সুপেয় সুমিষ্ট সলিলে তাপ-তপ্ত শত কণ্ঠ স্নিগ্ধ হইতেছে। আজ দুঃখ নাই, জ্বালা নাই, অভাব নাই;—আজ সকল ব্যথার অবসান। তাই মুসলমানের অধরে অধরে হাস্য ফুটিয়াছে, মুসলমানের গৃহ-

---

* হাওজে কওসর--বেহেশতের একটি বিশেষ সরোবর। ইহার জল দুগ্ধ অপেক্ষাও শুভ্র, মধু অপেক্ষাও মিষ্ট এবং বরফ অপেক্ষাও শীতল।

প্রাঙ্গণ উৎসবের কলধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে। বিভুর স্নেহাশীষ ধনী ও দরিদ্র, সুস্থ ও পীড়িত সকলের অন্তর সমভাবে স্পর্শ করিয়া পুণ্য-প্রীতিতে পুলকময় করিয়া তুলিয়াছে; রজনীর ভীম গাম্ভীর্য্য সে উল্লাস-গীতি স্তব্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছে না। দাতা মুক্ত হস্তে উল্লাসে অন্ন-বস্ত্র ও অর্থ দান করিতেছে; বলিষ্ঠ দুর্ব্বলের হস্ত ধরিতেছে; সুস্থ পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে অশ্রু ফেলিতেছে;—ভ্রাতার স্নেহে ভ্রাতার অন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। আজ কণ্ঠ কোমল, হৃদয় নির্ম্মল,প্রাণে মমতা,নয়নে করুণা। যে হস্ত বজ্রের মত আঘাত করিয়াছে, তাহাতে ধীরতা আসিয়াছে; যে কণ্ঠ পরের প্রাণে গরল ঢালিয়াছে, তাহা মধুর হইয়াছে।

ইহাই রমজানের হাস্যময় মোহন দৃশ্য—শান্তি-স্নিগ্ধ উষার আভা—স্নেহ-সিক্ত শেফালি-শ্বাস। করুণাময়ের করুণার ছায়া লইয়া প্রীতি ও শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যখন রমজান দেখা দেয়, তখন বেদনার অশ্রুবিন্দু সমবেদনার মুক্তাফলকে পরিণত হয়, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উৎসবের সঙ্গীতে জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কেমন করিয়া বুঝাইব কঠোরতায় এ কি কোমলতা, গাম্ভীর্য্যে এ কি মাধুর্য্য, গরলের মধ্যে এ কি অমৃত! দিবসের অবসানে উপবাসী

সাধকের ক্ষিন্ন বদন সমাচ্ছন্ন করিয়া যে প্রশান্ত প্রভা ফুটিয়া উঠে, উপবাসী সাধকের চিত্তে যে স্বর্গীয় শান্তি ও অমিত বলের সঞ্চার হয়, অভাগা অবিশ্বাসী তাহা বুঝিতে সক্ষম নহে। উপবাসী জনের মূর্খতা স্মরণ করিয়া অবিশ্বাসী হাস্য করিতে পারে, কিন্তু রমজানের বৈচিত্র্যে যে সুখ, যে মধুরতা আছে, তাহার আস্বাদ হইতে সে চির-বঞ্চিত। অভ্যাস মিষ্টকে তিক্ত ও স্নিগ্ধকে তপ্ত করে, রসের স্বাদ গ্রহণ করিবার শক্তি লোপ করিয়া দেয়। পুনঃ পুনঃ দর্শনে মোহিনী মূর্ত্তিও কর্কশ বোধ হয়, অবিরাম আঘ্রাণে গোলাপের মৃদুস্নিগ্ধ সুমিষ্ট গন্ধেও মধুরতা থাকে না। বিশ্বপাতা মানুষকে প্রতি মুহূর্ত্তে কত স্নেহ, কত দয়ায় ঘিরিয়া রাখিয়াছেন, অন্ন-জল ও ফল-মূলে মানুষের সুখের জন্য তিনি কি অমৃত ভরিয়া দিয়াছেন, তাহা চির-আহার-বিলাসীর ধারণার অতীত। উপবাস-বিমুখ ভোগী আহার করিয়াও অনাহারী,—পান করিয়াও তৃষ্ণাকুল। তাহার খাদ্যে রস নাই, সলিলে স্নিগ্ধতা নাই, তাহার জীবন অভিশপ্ত। অতৃপ্তির হাহাকারে নিরন্তর তাহার প্রাণ পরিপূর্ণ; সর্ব্বদা কামনা-তাড়নে সে অস্থির। কিন্তু আল্লার ভক্ত সেবক, উপবাসী মুসলমান যখন দিনান্তে বারিপূর্ণ পাত্র মুখে তুলিয়া লয়, তখন চিরঅপব্যয়িত, অবহেলিত জলে জীবন-সঞ্জীবনী অতুল স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হয়,

তাহার খাদ্যদ্রব্যের স্বাদে ও গন্ধে মধুর হইতে মধুরতর পীযূষ স্রাব হইতে থাকে। তখন খোদাতাআলার অপার দান ও করুণার সত্তায় মুসলমানের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে এবং এফ্‌তারের উৎসব-কোলাহল ভেদ করিয়া অতি সত্য, অতি পবিত্র কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস মঙ্গলময়ের উদ্দেশে ধীরে নীরবে উৎসারিত হইতে থাকে।

এই রমজান—এই শান্তি-মধুর, ভাব-গভীর রমজান,—কি গৌরবে এ ভাস্বর, কি মহিমায় দীপ্যমান! সাধনা ইহাকে গম্ভীর করিয়াছে, কল্যাণ ইহাকে স্নিগ্ধ করিয়াছে, উৎসব ইহাকে প্রাণময় করিয়াছে। এ বড় সাধের, বড় আদরের। ভক্ত ভাবুক মুগ্ধ মনে বলিতেছে—"হে সুহৃদ, হে রমজান! বর্ষে বর্ষে তুমি এমনই করিয়া এস, মরুভূমে সলিল বহাইয়া, কণ্টকে পুষ্প রচিয়া, অন্ধকারে আলো ফুটাইয়া, আশীষরূপে, কল্যাণরূপে, প্রিয়তম! ঘুরিয়া ঘুরিয়া তুমি এস। তোমার আগমনে আমরা পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উপনীত হই, স্ব-রূপে প্রকাশিত হই। আমরা আত্মসর্ব্বস্ব পশু নই—অধম নই, আমরা মানুষ—হৃদয়-বান,মহত্ত্বময়, প্রেমময় মানুষ,——আমরা স্নেহময় আনন্দ-ময় পরিবার, ইহা তোমারই কল্যাণে জানিতে পারি। তোমারই সঙ্কেতে করুণায় আঁখি ভরিয়া ভাইএর প্রতি

তাকাইয়া দেখি, মায়ের অশ্রু মুছাই। হে সুহৃদ! আমাদের হৃদয় ভরিয়া এস। জড়ের মায়া হইতে তোমারই স্পর্শে জাগ্রত হই, উপবাসের সংযম দিয়া তুমিই আমাদিগকে জানাও,—আমরা লালসাময় দেহ নই,—আমরা পুণ্যময় জ্ঞানময় চৈতন্যময় আত্মা,—বিভুর সেবা আমাদের পুলক, মুক্তি আমাদের কামনা,—পালকের প্রীতি আমাদের জীবন-জনমের সাধনা!

"এই কলুষময় সংসারে তোমার আগমনে আমরা বর্ষে বর্ষে মরণ হইতে জীবিত হই, সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠি! তাই, হে রমজান! তুমি বড় সাধের, বড় আনন্দের। তাই আমাদের শীর্ণ বাহু তুলিয়া তোমায় আবাহন করি।—হে নিত্য সত্য বিভুবাণি! বর্ষে বর্ষে তুমি এস, শান্তি রূপে, কল্যাণ রূপে এস,—চৈতন্য রূপে, সাধনা রূপে, আনন্দরূপে এস।"

আজান

বিশ্বরাজের আহ্বানবাণী আজানের মহাধ্বনি শুনিয়াছ কি ?—শুনিয়াছ কি সেই বিরাট সুমহান নিনাদ—মস্‌জিদে-মস্‌জিদে, গৃহে-গৃহে প্রাণবাণীর সেই সুগম্ভীর ঝঙ্কার—দিবসে, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, নিশীথে সেই প্রাণ-শিহরণ 'আল্লাহো আকবর' 'আল্লাহো আকবর' মহারব ? যদি না শুনিয়া থাক, তবে কিছুই শুন নাই।

মোহময় মানবজীবনে আজান চৈতন্যের মহাবাণী, পূজার আহ্বান, কল্যাণের মন্ত্র, সাধনার প্রেরণা। আজানের ভাব গভীর হইতে গভীর, মধুর হইতে মধুর। প্রতিদিন আজানের ধ্বনিতে ধ্বনিতে অনন্তের সত্তা জাগে, আজানের সুরে সুরে মর্ম্মে মর্ম্মে পুলক ছুটে, প্রভু-পূজার আহ্বানরবে প্রাণের পর্দ্দায় পর্দ্দায় ঝঙ্কার উঠে, হৃদয় ভরিয়া নিবেদনের আবেগ চঞ্চল হইয়া প্রকাশ পায়। একদিন বাঙ্গালী পরিব্রাজক কনষ্টান্টিনোপোলের প্রাসাদ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজানের মহাধ্বনি শুনিয়াছিলেন, শুনিয়া শুনিয়া সেই উদাত্ত গম্ভীর মধুর স্বরে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়াছিলেন !* এমন

* শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেনের 'ভূপ্রদক্ষিণ'।

প্রাণারাম ধ্বনি যদি না শুনিয়া থাক, যদি জীবনে একবার মুহূর্ত্তের জন্যও ইহার আভ্যন্তরীণ মহাভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া না থাক, তবে কিছুই শুন নাই, কিছুই বুঝ নাই।

আজানের ধ্বনি গম্ভীর ও মধুর, প্রাণভেদী ও প্রাণারাম। একদিকে যেমন ইহা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত ও প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে, অপর দিকে তেমনই সমগ্র প্রাণ অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে সিক্ত ও পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। যখন ধ্বনির পর ধ্বনিতে মহাশূন্য মথিত করিয়া করিয়া আজানবাণী ধীরে গম্ভীরে উদাত্ত সুরে উচ্চারিত হইতে থাকে, তখন নিদ্রার মোহ, সুপ্তির সুখ স্বপ্নের আবেশ স্বপ্নের ন্যায় মিলিয়া যায়, মোহাবিষ্ট অবশ মন চৈতন্যপুলকে জাগ্রত হইয়া উঠে; তখন সংসারের কুহক-মন্ত্র বিস্মৃতির মধ্যে বিলুপ্ত হয়, বিশ্বপ্রকৃতি বিচিত্র রূপ-রস বর্ণ-গন্ধ, ছন্দ-লীলা ও কল-সঙ্গীতের মোহিনী মায়া লইয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়ায়—ভক্তের প্রাণমন ভরিয়া শুধুই বাজিতে থাকে 'আল্লাহো আকবর,' 'আল্লাহো আকবর'। তখন অরূপ আসিয়া রূপ ঢাকিয়া ফেলে, অনন্ত আসিয়া সান্ত ভরিয়া দেয়, মানসে নয়নে শুধুই ভাসে 'আল্লাহো আকবর' 'আল্লাহো আকবর'; তখন মানুষ সুস্থ হইয়া

নিবেদনের জন্য—সাধনার জন্য—কল্যাণের নিমিত্ত ধ্যানের মন্দিরে আকুলভাবে ছুটিয়া যায়। তাই আজান চৈতন্যের বাণী, সাধনার প্রেরণা।

আজান-ধ্বনি দিন-যামিনী এই কথাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলে—মর্ম্ম-দ্বারে বারে বারে এই বারতাই ছুটিয়া ছুটিয়া বহিয়া আনে—কে কোথায় আছ মুগ্ধ সুপ্ত বিস্মৃত মানুষ, কে কোথায় সংসারের স্বার্থ-কোলাহলে ডুবিয়া আছ, কে কোথায় সংসারের কুহকমন্ত্রে আত্ম হারাইয়া অনন্ত ভুলিয়া সান্তে মজিয়া আছ, ঘরকে বাহির ও বাহিরকে ঘর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, ফিরিয়া এস, আত্মরূপে আপন ভাবে ফিরিয়া এস, হে বিস্মৃত মানুষ! প্রভুর আহ্বান আসিয়াছে, মোহমায়া হইতে জাগ্রত হও—প্রভুই শ্রেষ্ঠ, প্রভুই কাম্য—প্রভুর সকাশে ফিরিয়া এস; তোমার শত মোহ-গ্লানি, ক্লেদ-কলুষ, মিথ্যা-ছলনা পশ্চাতে ফেলিয়া কল্যাণ লাভের জন্য ছুটিয়া এস; এইখানেই তোমার রূপ, এইখানেই তোমার সত্তা—হে প্রবাসি! স্ববাসে এস; দূর হইতে নিকটে, মিথ্যা হইতে সত্যে, সান্ত হইতে অনন্তে ফিরিয়া এস; আপনাকে নিবেদন করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইবার জন্য ছুটিয়া এস।

জোহর বা মধ্যাহ্নের আজানে আজান-ধ্বনির এই

মর্ম্মবাণী পরিষ্কাররূপে উপলব্ধ হয়। তখন শুধু পৃথিবীর দৈনিক জীবনের চরম প্রকাশ নহে, তখন শুধু সূর্য্যের রশ্মিমালা ষোলকলায় উদ্ভাসিত নহে, মানুষের সাংসারিক জীবনেরও তখন মধ্যাহ্ন। কর্ম্মের কোলাহলে বিশ্বের অণু-পরমাণু শব্দায়মান। স্বার্থের সাধনায় মানুষের চিত্ত নৃত্য-মুখর পদ্মার মত চঞ্চল। চাহিয়া দেখ, বিশ্বের অঙ্গ ভরিয়া কর্ম্মের কি উদ্দাম উচ্ছ্বাস! কি ব্যস্ততা! কি চঞ্চলতা! এক অবিরাম ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে বিশ্বভুবন কর্ম্মোন্মাদনায় ভরপুর। ক্ষেত্রে-চত্বরে, ইস্কুলে-আফিসে, বাজারে-বিপণিতে কর্ম্মের অপার আকুলতা। মানুষ কর্ম্মচেষ্টায় অশ্রান্ত-ভাবে ছুটিতেছে, ঘুরিতেছে, লুটিতেছে। কোথাও চিন্তা করিবার অবসর নাই—সজ্ঞানতার লেশ নাই। সাংসারিক স্বার্থ-সাধনার অবিরাম কর্ম্ম-কোলাহলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জমান। মধ্যাহ্নের খরতাপে মানুষের বাহ্য-প্রকৃতিতেই শুধু একটা বিহ্বলতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, পরন্তু তাহার সমগ্র অন্তরও এক অবশ পার্থিব কর্ম্মানুগামি-তার ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ সাংসারিক কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়াছে। সংসারের মোহে মানুষ মুগ্ধ ও বিস্মৃত। তাহার আধ্যাত্মিক ভাব সর্ব্বপ্রকারে সুপ্ত ও বিলয়মান।

এমন সময়ে বিশ্বের এই কর্ম্মময় ভাব-স্রোত চঞ্চল ও স্তম্ভিত করিয়া হঠাৎ ভেরীধ্বনির মত বাণী উঠিল—'আল্লাহো আকবর,' 'আল্লাহো আকবর'। বাহ্য জগত এই মহারব শুনিবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। মানব-সংসারের সার্ব্বজনীন ভাবের সহিত ইহার কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই; ইহা মাধ্যাহ্নিক বিশ্বের কর্ম্ম-মুখর স্বার্থময় ভাব-স্রোতের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ও অভিনব সুর। যেন বহমান বারিধি-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সহসা আগ্নেয়গিরির অনলোচ্ছ্বাস গর্জ্জিয়া উঠিল, যেন সহসা মেদিনী ভেদিয়া দিগন্ত মথিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া ভীম দৈববাণী হইল! সে মহাধ্বনিতে বিশ্বের কর্ম্ম-স্রোত মুহূর্ত্তে রুদ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল; মানুষ চমকিত হইয়া শুনিল, 'আল্লাহো আকবর,'—'মহান আল্লা, মহান পাতা—তাঁহার অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, আর কিছু গরিষ্ঠ নাই। বিশ্ব তাঁহার, কর্ম্ম তাঁহার, রূপ তাঁহার, সুখ তাঁহার, ধন তাঁহার, ধান্য তাঁহার, জ্ঞান তাঁহার, মান তাঁহার, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পাতা, তিনিই প্রধান, তিনিই গরীয়ান।' পার্থিবতার ভাব-স্রোত মহাবেগে প্রতিহত করিয়া আবার ধ্বনি উঠিল, আশ্‌হাদো আন্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্', 'আশ্‌হাদো আন্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'—যেন সহসা চৈতন্যবাণী মূর্ত্ত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, যেন সর্ব্বব্যাপী

মোহাবেশের মধ্যে সহসা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিশ্ব-আত্মা মুহুর্মুহু বলিয়া উঠিল—'আমার সাক্ষ্য, আল্লা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই,' 'আমার সাক্ষ্য, প্রভু ভিন্ন আর কিছু কাম্য নাই;. মুগ্ধ মানুষ! কিসের সেবায় আত্ম হারাইয়াছ? তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছ? তিনি রাজার রাজা, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ রাজার উপাসনা করিতেছ? তিনি ধনের দাতা, তাঁহাকে ভুলিয়া কোন্ ধনের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছ? তিনি মানের মালিক, তাঁহাকে ত্যজিয়া কোন্ মানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছ? হে সত্য স্বরূপ! মিথ্যা ঐ ধন ও মান; তুচ্ছ ঐ যশ ও ক্ষমতা, ঐ ছায়ার পশ্চাতে ঘুরিয়া মরিও না, ঐ অনিত্যের সেবায় জীবন ক্ষয় করিও না; অনন্ত নিত্য পরম সত্য প্রভুই মাত্র উপাস্য, প্রভুই একমাত্র সাধনা ও আরাধনার ধন।' 'হাইআলাস্‌সালাহ্'—এস হে প্রভুর পূজায় ছুটিয়া এস,' 'হাইআলাস্‌সালাহ্'—প্রভুর সেবায়, সত্যের সাধনায়, অনন্তের আরাধনায় ছুটিয়া এস। 'হাই আলাল্ ফালাহ্'—কল্যাণ লাভের জন্য ছুটিয়া এস। মানুষ! ঐ হর্ষ ও হাস্য, দর্প ও দীপ্তি, স্বার্থসাধনার ঐ চল চল ছল ছল অপার অনাহত কর্ম্মস্রোত, উহাতে মঙ্গল নাই; ঐ সমস্ত বুদ্বুদের উপর রবিরশ্মির ক্রীড়ারাগ; মিথ্যা ও অনিত্য, ছায়া ও মায়া। প্রভুর সেবাই মাত্র

কল্যাণ; ইহাতেই সত্তা, ইহাতেই সুখ, ইহাতেই শুদ্ধি ও ইহাতেই মুক্তি। যে আসিবে, যে সেবা করিবে,—ডুবিবে ও মজিবে, অনন্ত জীবন—অনন্ত সুখ—অনন্ত হর্ষ তাহারই। ইহাই মোক্ষ, ইহাই কল্যাণ। 'হাই আলাল্ ফালাহ্'—'কল্যাণ লাভের জন্য ছুটিয়া এস'। এই আহ্বান যাহারা শুনিল ও বুঝিল, তাহাদের গতি ফিরিয়া গেল, বিশ্বের কর্ম্ম-স্রোত তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ ও মিথ্যা হইয়া গেল, তাহারা সকল ফেলিয়া, সকল ভুলিয়া আকুল হইয়া প্রভু-পূজায় ছুটিয়া গেল।

এমন চৈতন্যের স্বর, এমন আনন্দময় আশ্বাসময় পরিপূর্ণ কল্যাণ-বাণী আর কোথাও শুনিয়াছ কি? এই মিথ্যা ও ছলনার সংসারে সত্য সাধনা ও কল্যাণের দিকে এমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া আর কেহ ডাকিয়াছে কি? ইহা শঙ্খের মন্দ্রে নাই, ঘণ্টার ধ্বনিতে নাই, হার্ম্মোনিয়ামের সুরে ইহার ঝঙ্কার পাওয়া যায় না।

আজান মিলনের মন্ত্র—প্রেমের প্রেরণা। সাপুড়িয়ার বাঁশীর সুরে যেমন করিয়া সর্প ঢুলিয়া আসে, নবঘনের গুরু গুরু নাদে ময়ুর নৃত্য করে, চাতক উধাও হইয়া গগনে ছুটে, আজানের আহ্বানে আল্লার পানে মানুষ তেমনই ভাবে ছুটিয়া যায়। যখন মধুরে গম্ভীরে আজানের ধ্বনি উঠে,

যখন ধ্বনির পর ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত পুলকিত করিয়া আল্লার আহ্বান ছুটিতে থাকে, তখন অন্য চিন্তার অবসর থাকে না, অন্য কর্ম্মের সময় মিলে না; তখন আকুল হইয়া প্রভুর মিলনে সেবক ছুটিয়া যায়, সাগর মিলনে তটিনী ধায়, সান্ত অনন্তে প্রয়াণ করে।

আজানের মধ্যে মিলনের এই মহিমময় আহ্বান ব্যতীত মিলনের আরও একটা সুর আছে; তাহাও সার্থক ও সুন্দর। যখন আজানের আহ্বান উঠে, তখন পৃথক পৃথক উপাসনা হয় না, গৃহে গৃহে নিঃসঙ্গে নিবেদন চলে না; তখন উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ভুলিয়া, ধনের গর্ব্ব ও পদের মহিমা পশ্চাতে ফেলিয়া সেবার জন্য সমান ভাবে প্রভুর প্রাঙ্গণে আসিয়া মিলিত হইতে হয়; প্রভু-মিলনের মধ্য দিয়া ভাইএর সহিত ভাইএর, মানুষের সহিত মানুষের মিলন সার্থক হইয়া উঠে। এক আনন্দ-ময় গভীর প্রেম-তরঙ্গ সকল ভেদিয়া, সকল ঘিরিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে।

এই গভীর-মধুর মিলন-বাণী, এই চৈতন্যময়, কল্যাণময় আজান-ধ্বনি যদি না শুনিয়া থাক, তবে আর শুনিয়াছ কি? যদি বুঝিতে চাও আজান কি মহাভাবের প্রতিধ্বনি, কি গভীর গম্ভীর চৈতন্যের সুর, কি অমৃতময় মধুর বাণী, তবে

মোহ ও জীবন, আলো ও অন্ধকারের বেলাভূমে দাঁড়াইয়া ফজর বা উষার আজান-ধ্বনি নীরব হইয়া শ্রবণ কর।—এখনও অন্ধকার ভেদিয়া আলোকমালা উছলিয়া উঠে নাই, এখনও বিশ্বের অণু-পরমাণু ছন্দে ছন্দে বাজিয়া উঠে নাই—তবু মূর্চ্ছার শেষ, অন্ধকারের অবসান। বিশ্বভুবন নব জীবনের প্রতীক্ষায় নীরব। বৃক্ষ নীরব, গৃহ নীরব—গৃহী নীরব, প্রাণ নীরব—প্রাণী নীরব, বিরাট বিশ্ব বিরাট ব্যোমের আলিঙ্গনে স্থির গম্ভীর নীরব! এই গম্ভীর নীরবতার মধ্যে নবজীবনের সুরভিশ্বাস; প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে স্নিগ্ধ শান্তির জীবন-সঞ্জীবন সুধাধার। এমন মহা-মূহূর্ত্তে ঐ শুন মহাবাণী—ঐ শুন বিশ্বব্যোম আলোড়িত করিয়া, নীরব মাধুরী মথিত করিয়া, জীবনের স্পন্দন ছুটাইয়া ধ্বনি উঠিতেছে, 'আল্লাহো আকবর,' 'আল্লাহো আকবর'; শুন; কান পাতিয়া প্রাণ ভরিয়া শুন—দূরশ্রুত বীণা-ধ্বনির মত মধুর, দৈববাণীর ন্যায় গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মহাবাণী—'আল্লাহো আকবর' 'আল্লাহো আকবর,' মরণতন্দ্রার: অবসানে বিশ্বের প্রথম জীবন-বাণী, হর্ষ ও কৃতজ্ঞতার মধুর মধুর প্রণব স্বর; যেন শান্তি, সৌরভ ও পবিত্রতার সুধাধারার মধ্যে জাগ্রত হইয়া বিশ্ব-পতির উদ্দেশে বিশ্ব-চিত্ত কৃতজ্ঞতার পরিশুদ্ধ পুলকে কম্পিত

হইতেছে ; ভক্ত প্রাণ ভরিয়া বলিতেছে, 'জয় জয় আল্লাহ্' জয় বিশ্বরাজ—মহিমায় মহান, করুণায় গরীয়ান আল্লার জয়, আল্লার জয় ; বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, জীবনের যিনি পাতা, সেই পরম প্রভু আল্লার জয়, আল্লার জয়। তাঁহারই মহিমায় আঁধারের অবসান, মরণের শেষ ; তাঁহারই করুণায় আঁধার ভেদিয়া নবীন জীবনের জ্যোতিঃ ছুটিতেছে, তাঁহারই কৃপায় নিদ্রার মৃত্যু-মোহ ভাঙ্গিয়া কণায় কণায় জীবনের পুলক জাগিতেছে। "আশ্‌হাদো আন্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" 'আশ্‌হাদো আন্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' —'আমার সাক্ষ্য, সেই পরম পাতা প্রভুই মাত্র উপাস্য' 'আমার সাক্ষ্য, সেই প্রভুই মাত্র আরাধনার ধন'। শুন শুন, জীবন-প্রভাতে প্রাণ-বাণীর ঝঙ্কার শুন; শুভ্র শান্ত সুপবিত্র মহামুহূর্ত্তে মহিমময় বিশ্বরাজের সমীপে মানবের জীবন-সাধনার সাক্ষ্য শুন ; বিগতমোহ বিগতগ্লানি শুদ্ধ বুদ্ধ মানুষ জীবন-যাত্রার প্রারম্ভ-ক্ষণে বলিতেছে,—"জীবনে একমাত্র প্রভুকেই আরাধনা করিব, প্রভুকেই কামনা করিব, প্রভুরই সাধনা করিব ; 'আশ্‌হাদো আন্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'—আমার সাক্ষ্য, পরমপাতা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই।" এত বড় সাক্ষ্যবাক্য জগতে আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই।

এমন সম্ভ্রমময় মহামুহূর্ত্তে এত বড় সাক্ষ্য ভিন্ন আর কোন বাক্য হইতে পারে না। তাই এই সাক্ষ্য-বাক্য মর্ম্মে মর্ম্মে মধু ঢালিয়া দিল, প্রভাত-পবনে শান্ত নীরব ভুবন ভরিয়া সাক্ষ্য বাজিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" আবার আবার—সুরতরঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিল। 'আশ্হাদো আন্না মোহাম্মদার রসুলুল্লাহ্', 'আশ্হাদো আন্না মোহাম্মদার রসুলুল্লাহ্'—'আমার সাক্ষ্য, নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লার প্রেরিত; বিশ্বের যিনি পাতা, আলোক যাহার কৃপা, জীবন যাহার করুণা, মোহাম্মদ সেই পরম প্রভুর দয়ার ছায়া, মোহাম্মদ সেই আল্লার স্নেহের পরম দান। এ ছায়ায় যে আসিবে, এ দান যে বরণ করিবে, অনন্ত করুণায় সে স্নাত হইবে, জীবন জনম সফল হইবে। শুন, পাপী শুন, তাপী শুন; নিরাশায় কাহার বুক ভাঙ্গিয়াছে, কাহার পথের আলো নিবিয়া গিয়াছে—আশ্বাসবাণী শুন, সান্ত্বনাময় সাক্ষ্য শুন, 'নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লার প্রেরিত' নিশ্চয় উদ্ধার করিবার জন্য, জীবন দিবার জন্য আল্লার করুণারূপে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহার আশ্রয় লও, দয়াল দাতার সন্ধান মিলিবে। 'হাই আলাস্সালাহ্,' 'হাই আলাস্সালাহ্'

মোহাম্মদ আল্লার প্রেরিত'; নিশ্চয় উদ্ধার করিবার জন্য, জীবন দিবার জন্য আল্লার করুণারূপে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহার আশ্রয় লও, দয়াল ধাতার সন্ধান মিলিবে। 'হাই আলাস্‌সালাহ্‌,' 'হাই আলাস্‌সালাহা,' 'এস এস, প্রভু-পূজায় ছুটিয়া এস,' 'আল্লার আরাধনার জন্য ছুটিয়া এস'। জীবনদাতা পরম পাতা দয়াল ধাতার সমীপে জীবন-প্রভাতে প্রাণের নিবেদন জানাইবার জন্য ছুটিয়া এস। 'হাই আলাল ফালাহ্‌,' 'হাই আলাল ফালাহ্‌,'—কে কল্যাণ চাও কে নিদ্রাবসানে নব জীবনের শান্তি সৌরভ ও মাধুরী চাও, কে মোহ-নিদ্রা শেষে অনন্ত জীবন ও অনন্ত হর্ষ চাও, প্রভু পূজায় ছুটিয়া এস; কল্যাণের তরে ছুটিয়া এস। 'আস্‌সালাতো খায়রোম্‌ মেনাম্‌ নওম,' 'আস্‌সালাতো খায়রোম্‌ মেনাম নওম্‌'; শুন শুন, সুপ্ত মুগ্ধ মানুষ শুন, 'নিদ্রাপেক্ষা প্রার্থনা উত্তম'; বিলাস-বিভোর ধনী শুন, সুখাবিষ্ট যুবক যুবতী শুন, বালক বালিকা বৃদ্ধ শুন, চৈতন্যের আহ্বান শুন, কল্যাণের প্রেরণা শুন, নিদ্রাপেক্ষা প্রভুপূজা পরমোত্তম; কি ছার মূর্চ্ছাসুখে মজিয়া আছ, সজ্ঞান হইয়া স্বস্থ হইয়া প্রভুর পূজায় ছুটিয়া এস, অমৃতের আস্বাদ পাইবে; কি ক্ষণিক শ্রান্তিতে আত্ম

হারাইয়াছ, আল্লার আরাধনায় এস, অনন্ত শান্তি পাইবে ; কি স্বপ্নের সুখাবেশে বিভোর হইয়া আছ, প্রিয়তমের সদনে এস, কল্প কল্প নিত্য সত্য আনন্দ পাইবে। কে মোহ-নিদ্রায় ডুবিয়া আছ, কে স্বপ্ন মায়ায় মজিয়া আছ, কে সুখাবেশে ঢলিয়া আছ, .জাগ, উঠ, .প্রভু পূজায় ছুটিয়া এস। 'আল্লাহো আকবর,' আল্লাই শ্রেষ্ঠ,' 'আল্লাই শ্রেষ্ঠ'। 'লাইলাহা ইল্লালাহ, আল্লাই মাত্র উপাস্য,'—প্রভুই মাত্র কামনার ধন।

এইরূপে আজানের মধুর-গম্ভীর স্বর-লহরী শান্ত নীরব বিশ্ববক্ষে জীবনের স্পন্দন তুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছুটিয়া গেল ; আল্লার আহ্বান-রবে মর্ম্মে মর্ম্মে চৈতন্য জাগিল। মানুষ হৃদয় ভরিয়া আনন্দ লইয়া, সজ্ঞান ইন্দ্রিয় লইয়া, নির্ম্মল চিত্ত লইয়া, নবীন জীবন লইয়া প্রভু-পূজায় ছুটিয়া গেল ; বিশ্বভুবন নবজীবনের আলোক, পুলক ও ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ হইল।

উপাসনা

কালের দূর দূরান্তে মানবচিত্তে উপাসনার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, কবে কোন্ কান্তার-প্রান্তরে গিরি-গহ্বরে মানব প্রথম বিশ্বপাতার উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণতি করিয়াছে, মানুষের ইতিহাস তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কিন্তু স্রষ্টার নিকটে মানবের আত্মনিবেদন মনুষ্য-সৃষ্টির মতই পুরাতন, মানুষের দৈহিক ক্ষুধার ন্যায়ই চিরন্তন। আদি মানুষ যখন নয়ন মেলিয়া বিচিত্র ধরাধাম দেখিয়াছে, তখন তাহার মন স্বতঃই অপরূপ বিস্ময় ও পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে,—কি সুন্দর এ পৃথিবী! গাছে গাছে, লতায় পাতায় ভরা, ফুলে ফলে শোভিতা, আলোজলে সঞ্জীবিতা—কি অপূর্ব্ব! কি বিচিত্র! সুনীল সাগরের অপার উন্মাদ তরঙ্গ-লীলা, আর তাহার মধ্য হইতে তরুণ অরুণের সুরক্তিম হাস্য-বিভাস—কি বিরাট! কি মনোহর! উপরে ঐ অসীম আকাশ,—ঐ বিশাল নীলিমালীলা, কোটি কোটি তারকার মেলা, সূর্য্য চন্দ্রের খেলা, আলোকের ঝলক, কিরণের ক্রীড়া,—কি অপরূপ! কি অসীম!

কি সুন্দর! মনুষ্য এই সমস্ত দেখিয়াছে, আর তাহার মন বিস্ময়-পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক অজ্ঞাত অনুভূত বিরাট শক্তির সত্ত্বায় তাহার অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনের পর রাত্রি আসে, ব্যোম ভুবন ঘিরিয়া আঁধার নামে, আকাশ ভাঙ্গিয়া মেদিনী মথিয়া দিগন্ত ছিঁড়িয়া ঝঞ্ঝা ছুটে, বজ্রগর্জ্জনে প্রাণ কাঁপে, বিদ্যুত-ঝলকে নয়ন ঝলসে, কে করে—কে ঘটায়? মানুষ সভয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আর অজ্ঞাত জগত-কারণের সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া লুটাইয়া লুটাইয়া বলিয়াছে, কে তুমি ধাতা—ভয়াল বিশাল বিরাট মহান? তোমাকে প্রণাম করি। তোমাকে জানিনা, কিন্তু তুমিই ঘটাও, বাঁচাও। বজ্রবিদ্যুৎ তোমারই লীলা, জ্যোৎস্না-সমীরে তোমারই খেলা, ফলে জলে তোমারই করুণা,—তুমিই পরম-চরম, তোমাকে প্রণাম।

কার্‌লাইলের মতে এই ভাবে মানুষের মনে উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকাশমান বিশ্বসৃষ্টির অপার রহস্য ও অপরিসীম শক্তি-লীলা দর্শনে মানুষের মনে যে বিপুল বিস্ময় জাগিয়াছে, সেই অগাধ অপ্রমেয় বিস্ময়ের প্রকাশই উপাসনা। এই বিস্ময়ই মানুষের

মনকে স্তম্ভিত করিয়া অপরিসীম শক্তিশালী স্রষ্টার সম্মুখে মানুষের মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছে।

আমি মানুষের সরল চিত্তে বিস্ময় এই প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বিশ্বমানবের মন ও মস্তক শুধু বিস্ময়েই স্রষ্টার উদ্দেশে নত হয় নাই; বিস্ময় অপেক্ষা গভীর ভক্তিতেও মানুষের প্রাণ আকুল হইয়া স্রষ্টার উদ্দেশে ছুটে নাই। ফলশস্যরৌদ্রজলে বিশ্বপাতার জীবনপোষণ অপার করুণা দেখিয়া মানুষের অন্তর স্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে সিক্ত হইয়াছে; জন্মিবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে ক্ষীরধারার সঞ্চার দেখিয়া—পীড়ার পূর্ব্বে বনে বনে লতায় পাতায় জীবন-সঞ্জীবন ঔষধির সমাবেশ দেখিয়া—মানুষের মন বিশ্বপাতার প্রতি অসীম প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে; অরুণের স্বর্ণ কিরণে, চন্দ্রমার স্নিগ্ধ হাস্যে, পুষ্পের মনমোহন মাধুরীতে, তরু-পল্লবের শ্যামশোভায়, মানুষের মন স্রষ্টার প্রতি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু উপাসনার মূল কারণ ইহার কোনটাই নহে।

মুসলমান শাস্ত্রমতে পৃথিবীতে মনুষ্যসৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, দুঃখের দাবদাহের মধ্যে উপাসনার উদ্ভব। আদিপুরুষ হজরত আদম ভূতলে

মাথা লুটাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লার বন্দনা করিতেছেন; হৃদয় ভাঙ্গিয়া আল্লার নিকট বিনয় নিবেদন করিতেছেন। অনুশোচনার সংক্ষোভে তাঁহার দীর্ঘদেহ কম্পিত হইতেছে; পৃথিবীর তরুপল্লবের শ্যামশোভা, প্রকৃতির উদার নগ্নমূর্ত্তি, সূর্য্য চন্দ্রের পূর্ণ দীপ্তি কিছুই তাঁহার নয়নে ঠেকিতেছে না। তাঁহার অন্তর আকুল হইয়া ইহার উর্দ্ধে ও অতীতে স্রষ্টার সমীপে লুণ্ঠিত হইতেছে।

আদিমানবের এই যে বেদনা ও প্রার্থনা, ইহা অসীম সুখ-সুষমাময় স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া নহে। সকল সুখের উৎস সকল সুষমার আলয়—আল্লার নিকট হইতে বিদূরিত হইয়া, জীবনের মূল হইতে স্খলিত হইয়া; জীবনের উৎস—পরম চরম প্রভু রুষ্ট হইয়াছেন,—দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন—এই দুঃখে। পুনরায় তাঁহার দয়া ও সান্নিধ্য লাভ করিবার নিমিত্ত,—সেই মূলের রসে জীবন সরস করিবার জন্য—আদম-চিত্তের এই সংক্ষোভ এই বেদনা, অশ্রুজলে তিতিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া এই প্রার্থনা। স্বর্গচ্যুতির দুঃখ ইহার নিকট পৌঁছিতে পারে না।

স্বর্গচ্যুত আদমের বেদনা ও প্রার্থনার মধ্যে উপাসনার

মূল কারণের সূক্ষ্ম ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা বিস্ময় হইতে গভীর, ভক্তি হইতে নিগূঢ়, কৃতজ্ঞতা হইতে মধুর ;—তাহা মানবাত্মার ধর্ম্ম। আত্মার তাহা ক্ষুধা। নদীর সিন্ধু গমনের মত, রবি-করে নলিনী-স্ফুটনের মত, জলদোদয়ে চাতকের আনন্দের মত, প্রদীপ-পাশে পতঙ্গের সমাগমের মত, তাহা সত্য—সুন্দর ও স্বাভাবিক। অদ্ভুত অহেতুক আকর্ষণে পতঙ্গ যেমন আলোকের দিকে ছুটিয়া যায়, মানবাত্মাও তেমনি আকুল আবেগে স্রষ্টার পানে ছুটিয়া যায় ; বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় মূলের সহিত মিলিত হইতে চায়। উপাসনা ইহারই প্রকাশ। উপাসনার মধ্যে মানবাত্মা আপনাকে স্রষ্টার চরণতলে লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহারই মধ্যে হারাইয়া যাইতে চায়,—বিলুপ্ত বিস্মৃত হইতে চায়।

উপাসনার এই স্বরূপ হজরত ইব্রাহিমের ধর্ম্মজীবনে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। বালক পয়গম্বর উপাস্যের সন্ধানে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার দেলদরিয়ায় তুফান উঠিয়াছে, অন্তর আরাধনার আবেগে অশান্ত হইয়াছে। চিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, সে কৈ ? সে প্রভু কৈ ? সে আরাধনার ধন কৈ ? লতায় পাতায় তাঁহার লেখা দেখা যায়, ফলে জলে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে

তাঁহার দয়া হিল্লোলিত হয়, স্নিগ্ধ সমীরণে তাঁহার স্মৃতি ভাসিয়া আসে, ফুলে ফুলে তাঁহার গন্ধ পাওয়া যায়, সে কৈ ? সে পাতা কৈ ? সে প্রভু কৈ ? সে পরম চরম জীবনস্মরণ দয়িত কৈ ?

তাঁহার পৌত্তলিক আত্মীয় স্বজন প্রতিমা দেখাইল, প্রতিমার সম্মুখে মস্তক নত করিতে বলিল। কিন্তু এ যে মাটির পুতুল,—হাতে গড়া, খেলার জিনিষ, ডাকিলে সাড়া দেয় না, মাথা নোয়াইলে মনের মাঝে অমৃত ঢালে না, এ কুড়ুল দিয়া ভাঙ্গা যায়, ভাঙ্গিয়া গড়া যায়, এ ত সে নয় ! সে কি ঐ তারা ? ঐ হীরার ফুল, সোনার বাতি—ঐ মনোহর তারকাই কি সেই ? না—না জ্বলিয়া নিবিয়া যায়, ফুটিয়া ডুবিয়া সরিয়া যায়, ও সে নয়। সে অত ছোট নয়। সে কি তবে ঐ ? সুধার আধার, শোভার রাশি, ঐ মধুর-মোহন গগন-শোভন চন্দ্রই কি সেই ? সেই শোভাময় আনন্দময়ের কি ঐ রূপ ? না—না, উহারও ক্ষয় আছে, বিলয় আছে। সূর্য্যোদয়ে উহাও মলিন হইয়া যায়। সে কি তবে ঐ সূর্য্য ? —ঐ হাস্যময় জীবনময় বিরাট বিশাল সূর্য্য—ঐ কি প্রভু ? উহার উদয়ে অন্ধকার পলাইয়া যায়, আলোকে জীবন ছুটে; জীবজগৎ জাগিয়া বাঁচিয়া ফুটিয়া উঠে ; ভীষণ

উহার তেজ, দুর্ব্বার উহার প্রতাপ,—ঐ কি সেই বিরাট অধীশ্বর? না—না উহারও বিলয় আছে; অন্ধকার উহার চেয়েও বলবান। যাহার ক্ষয় আছে, বিলয় আছে, দুর্ব্বল ও অধীন যে, সে কখনও আমার প্রভু নহে। সে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র নহে। উহারা স্থায়ী নহে, স্বাধীন নহে। উহারা কাহার কাহিনী ঘোষণা করে? কাহার কাজ করে? সে তবে কে? এই দৃশ্যমান বিশ্বের তবে কর্ত্তা কে? কাহার সকাশে মাথা লুটাইব?

পয়গম্বরের চিত্তে প্রেরণা জাগিল। স্রষ্টার সন্ধানে উপাস্যের অন্বেষণে তাঁহার আত্মা জড়াতীত চৈতন্য-লোকে—তরুলতা-সূর্য্যচন্দ্র-বায়ু-ব্যোম অতিক্রম করিয়া অনন্তের মধ্যে প্রয়াণ করিল। তিনি বুঝিলেন, বিশ্বের যিনি স্বামী, মস্তকের যিনি প্রভু, মনের যিনি দয়িত, তিনি আল্লাহ্ তাআলা—সকলের প্রধান, মহান, দয়াবান, ভয়াল ও সুন্দর। তিনি অরূপ, অপরূপ; সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, বিশাল হইতে বিশাল। চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না, হস্ত তাঁহাকে গড়িতে পারে না, দেহ তাঁহাকে ধরিতে পারে না, কল্পনা তাঁহাকে আঁকিতে পারে না।—ধ্যানের ধন, প্রাণের প্রিয়;

তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই উপাস্য। আমি তাঁহাকে চাই, তাঁহারই আরাধনা করি।

সেই যে অরূপ অপরূপ আল্লার ধ্যানে তাঁহার মন মজিয়া গেল, তাহা আর টলিল না। যে আরাধনায় তিনি মগ্ন হইলেন, অগ্নির দাহন তাঁহার নিকট ক্রিয়া করিতে পারিল না।

এই অরূপ অব্যয় চিন্ময় উপাস্যের আকুল অন্বেষণ ও তাহারই মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন, ইহাই আরাধনার স্বরূপ। ইহাই মানবাত্মার ধর্ম্ম। স্রষ্টার সন্নিহিত হইতে না পারিলে, চিত্ত ও জীবনে তাঁহাকে অনুভব করিতে না পারিলে, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় জরজর হইয়া তাঁহার সম্মুখে লুণ্ঠিত হইতে না পারিলে, তাঁহার সহিত মিলনানুভূতির পুলকাবেশে তাঁহারি মধ্যে ডুবিয়া মিশিয়া মুছিয়া যাইতে না পারিলে, কিছুতেই মানবাত্মার শান্তি নাই। মানবাত্মার ইহাই চরম পরিণতি, সুস্থ আত্মার ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা।

জীবণে মরণে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল স্থানে সকল অবস্থায় মানুষের মন এমন কিছু অবলম্বন চাহে, যাহা দেহাতীত ও মায়াতীত—অনন্ত শক্তিময়, অনন্ত জ্ঞানময়, অসীম করুণাময়—সংসারের সুখ-দুঃখ,

ঘাতপ্রতিঘাত ও উত্থানপতনে বিচিত্র সংঘর্ষময় জীবনে যাহাকে আশ্রয় করিলে অন্তিমে সান্ত্বনা মিলে ; সকল আশা-আকাঙ্খা দগ্ধ হইলে চিত্ত যেখানে স্থির হইতে পারে ; মানসে যাহাকে ধারণা করা যায়, কামনা যাহাকে নিবেদন করা যায়, নিবেদনে আনন্দ পাওয়া যায় ; জীবন সংগ্রামে ছিন্নক্লান্ত অবসন্ন মন যাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাঁফ ছাড়িতে পারে।

সকল উপায় অবলম্বন শূন্য হইলে দুঃখের মধ্যে আত্মা তাহাকে ঘিরিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া ফিরে। সুখের বিলাস লীলার মধ্যে এমন সকল মুহূর্ত্ত আসে যখন স্বর্ণরৌপ্য তুচ্ছ হইয়া পড়ে, মণিকাঞ্চনে মন মজে না, রমণীরূপে মাধুর্য্য থাকে না। সুকোমল শয্যায় হাস্যতরঙ্গের মধ্যে মন সহসা কাহার জন্য অশান্ত হইয়া উঠে, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কিসের অভাবে হৃদয় হু হু করিয়া উঠে। বলিতে ইচ্ছা হয়—"আমার মন যে টানে, কিসের টানে, কেউ তা জানে না।"

হজরত মুসার সময় এক মুর্খ মেষপালকের মনে মানবাত্মার এই ক্ষুধা মূলের সহিত মিলনের এই তৃষ্ণা অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। হজরত

মুসা এক পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে যাইতে এই মেষ-পালককে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দীনহীন মেষপালকের মনবীণায় তখন অপূর্ব্ব ছন্দে প্রেমবন্দনার ঝঙ্কার উঠিতে-ছিল,—"হে প্রিয়! তুমি কোথায়? তোমাকে পাইলে মাথার কেশ দিয়া তোমার চরণ মুছাইয়া দিতাম, পাখা দিয়া তোমাকে বাতাস করিতাম, কাল গা'য়ের দুধ দোহাইয়া তোমাকে খাওয়াইতাম, তুমি ঘুমাইলে তোমার পাশে জাগিয়া থাকিতাম, তুমি হাঁটিলে তোমার পদতলে হৃদয় পাতিয়া দিতাম, প্রভু, তোমার প্রীতির জন্য আমার সর্ব্বস্ব লুটাইয়া দিতাম, প্রিয়তম, তুমি কোথায়?"

সরল নির্ম্মল কৃষাণপ্রাণের এই অনাহুত নিবেদন মূলের প্রতি মানবচিত্তের স্বাভাবিক আসক্তির অতি সুন্দর অতি মধুর মোহময় অভিব্যক্তি। এই আসক্তি মানুষের জীবনে সান্ধ্য সমীরণের মত ভাসিয়া আসে, গভীর রাত্রে দূরাগত বীণাধ্বণির মত প্রাণের মধ্যে বাজিয়া উঠে, এবং চিত্ত একেবারে উদাস করিয়া ফেলে। দিনের মধ্যে জীবনের কাজ করিতে করিতে মানুষ সহসা চমকিয়া উঠে—কি এক অহেতুক আকর্ষণে আকুল হইয়া পড়ে। পরমচরম প্রভুর সহিত যোগ স্থাপন করিবার

জন্য, মূলের সহিত মিলনের নিগূঢ় রস পান করিবার নিমিত্ত ক্ষুধিত মর্ম্ম আর্ত্তনাদ করিতে থাকে,—

"বেশনও আজ নায় চুঁ হেকায়ত মিকুনদ,
আজ জুদাইহা শেকায়েত মিকুনদ;
কাজ নায়েসতাঁ তা মরা বুরিদা আন্দ,
আজ নফিরম মরদ্ ও জন্ নালিদা আন্দ।" (রুমী) *

শুন, শুন বাঁশীর কাহিনী শুন,—বিরহ বেদনায় সে বিলাপ করিতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে শরস্থান হইতে যখন আমাকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তখন হইতে আমার আর্ত্তনাদে নরনারী ক্রন্দন করিতেছে। বাঁশী কি গান গায়?—বিরহ বেদনায় বিলাপ করে? সুরে সুরে তাহার মূলচ্ছিন্ন প্রাণ গুমরিয়া গুমরিয়া বেদনা জানায়। মূল হইতে তাহাকে ভিন্ন করা হইয়াছে বলিয়া দাগে দাগে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার প্রাণের বিরহ-বেদনা আকুল হইয়া বাহির হইতেছে। সে সুর বড় করুণ, বড় মধুর, বড় মর্ম্মস্পর্শী। গভীর নিশীথে তাহাতেই বাঁশীর রাগিনী শুনিয়া মানবমন করুণ বেদনায় ভরিয়া

* بشنو ازنی چون حکایت میکند * از جدایي ها شکایت میکند
کز نیستان تا مرا ببریده اند * از نفیرم مرد و زن نالیده اند

উঠে। ব্যথা শুনিয়াই ব্যথা মনে পড়ে, অশ্রু দেখিয়াই চক্ষু ভরিয়া জল আসে।

বাঁশীর যে কথা আত্মারও সেই কথা। বাঁশীই আত্মা। কবি বাঁশীর বিলাপ দিয়া মানবাত্মার ক্ষুধা চমৎকার করিয়া বুঝাইয়াছেন। আত্মার মধ্যেও বিচ্ছেদের ব্যথা লুক্কায়িত আছে, নিদারুণ শোকের ছিদ্র আছে। তাই থাকিয়া থাকিয়া কিসের অভাবে শিহরিয়া উঠে, কিসের তৃষ্ণায় আকুল হয়। আত্মা বিলাপ করিয়া বলে,—

কোন্ দেশে সে বিহরে,
কত দূরে কার ঘরে,
বাসনা পূজিতে তারে নয়নের জলে।

চাই, তাহাকে চাই,—কোথায় সে? আমার প্রভু, আমার উৎস,—আমার চরম—সে কৈ? সে কোথায়? তাহাকে ধরিতেই হইবে, পাইতেই হইবে, নহিলে কিছুতেই হাহাকারের নিবৃত্তি হইবেনা। নহিলে সকলি বৃথা, সকলি অসার; এ জীবন শূন্য, এ অন্ধকার পারাবারে আমি একা—নিতান্ত একা।

এই যে মূল হইতে বিচ্ছেদবোধের বেদনা, নিঃসঙ্গতার নিগূঢ় অনুভূতি এবং মূলের সহিত মিলন তৃষ্ণা ইহাই আরাধনার মূল কারণ। দৈহিক উপাসনা ইহারই ফল

ও পরিণাম। স্রষ্টার সন্নিহিত হইতে, মূলের সহিত মিলনের নিগূঢ় অনুভূতির রসে মজিয়া যাইতে মানুষ উপাসনা করে; স্বীয় সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বাঙ্গ দিয়া মূলের সহিত মিশিয়া যাইতে চায়। আত্মা যখন স্রষ্টার উদ্দেশে আকুল হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন বিচ্ছেদব্যথা প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ অবনত ও লুণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাহাই মানবাত্মার আর্ত্তনাদ, বংশীর ক্রন্দন, বুলবুলের বিলাপ। মন যখন বিস্ময়, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে, তখন মানুষ পরম পাতার সম্মুখে অবনত হইয়া গদ্‌গদ্‌ করিয়া প্রাণের নিবেদন ব্যক্ত করিতে চায়; মূলের সহিত মিলনানুভূতির বিমলানন্দে আত্মা যখন হর্ষে সরস হইয়া উঠে, তখন দেহ ও মস্তক পরমচরম প্রভুর পানে নত হইয়া লুটাইয়া লুটাইয়া তাঁহার সহিত মিশিয়া যাইতে চায়, স্বীয় সর্ব্বস্ব তাঁহাকে নিবেদন করিতে চায়। মানুষ যতক্ষণ ইহা না করে, ততক্ষণ কিছুতেই তাহার প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না, হাহা-কারের নিবৃত্তি হয় না। নিঃসঙ্গতার ব্যথায়, মিলনের তৃষ্ণায়, মানুষ স্রষ্টার সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া লুটাইয়া পড়ে, লুটিয়া লুটিয়া মিলনের আনন্দ পায়, আনন্দে পড়িয়া পড়িয়া লুটাইতে থাকে। ব্যথা তৃষ্ণা ভয় ভক্তি বিস্ময়

ও আনন্দ যখন ভিতরে তীক্ষ্ণ তীব্র ও উদ্বেল হইয়া উঠে, বাহির তখন তাহার আবেগে কম্পিত হয়, মানুষের সর্ব্বাঙ্গে তাহার ক্রীড়া ফুটিয়া উঠে। ফল যখন ভিতরে রসে গন্ধে পূর্ণ হয়, তখন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া পাকিয়া উঠে, বিনা বাতাসে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। তাম্রতারের অভ্যন্তরে যখন তড়িত প্রবাহ ছুটে, তখন সমস্ত তার থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। মানুষ অমনি করিয়া আত্মার চিরন্তন তৃষ্ণায় স্রষ্টার সম্মুখে লুণ্ঠিত হয়, পরম পাতার আরাধনা করে। এই তৃষ্ণারই তাড়নায় ফিজি-দ্বীপের রাক্ষস-মানুষ তরবারীর পূজা করে, আফ্রিকার উলঙ্গ নিগ্রো পাথরে মাথা ঠেকায়।

মানুষ কোন দিন উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে নাই, থাকিতে পারে না। উপাস্যের সন্ধানে ও নির্ব্বাচনে তাহার ভুল হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার আভ্যন্তরীণ তৃষ্ণায় মানুষ চিরদিন মহত্তর শক্তির সম্মুখে দেহ ও মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া আসিতেছে। মানুষ আপনাকে নিবেদন করিতে চায়, মূলের মনোময় আকর্ষণে প্রভুর সমীপে সর্ব্বস্ব সহ লুটাইতে চায়, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চায়। জরজর কলেবরে তাঁহার সমীপে লুণ্ঠিত হইতে না পারিলে, তাঁহার

সহিত মিলনানুভূতির অমৃতরসে মজিয়া যাইতে না পারিলে, কিছুতেই মানবাত্মা শান্তি পায় না; ইহাই উপাসনার সার ও ইহাই উপাসনার সাধনা।

নামাজ

আমি নামাজ পড়িব,—প্রাণের ব্যথা নিবেদন করিব, এ চিত্তের ক্ষুধা মিটাইব; কায়া ও মায়ার অতীতে চৈতন্যের সুধাতরঙ্গে ডুবিব ও মজিব। বিশ্বের শব্দ-ছন্দ স্তব্ধ করিয়া দাও, আলোকের সীমারেখা লুপ্ত হউক, আমি অসীম মৌনতায় অনন্তের মধ্যে ডুবিয়া যাই।

কেন নামাজ পড়ি, কেমন করিয়া বলিব? কেমন করিয়া বলিব নদী সমুদ্রে যায় কেন? প্রদীপে পড়িয়া পতঙ্গ মরে কেন? মেঘ-নাদে ময়ূর নাচে কেন? কেমন করিয়া বলিব, কেন?

নামাজ পড়ি প্রভুর প্রীতির জন্য। তিনি আদেশ করিয়াছেন তাহাই পালন করি, বিনত শিরে প্রণতি করি। কিন্তু তাহাতে প্রভুর কি? আমার বন্দনায় কি তাঁহার আনন্দ হয়? আমার এই দেহের উত্থান

পতন, ইহাতে কি তিনি সুখ বোধ করেন ? তাঁহার আবার সুখ কি ? আমি নামাজ না পড়িলে তাঁহার কি আসে যায় ? তাঁহার সুখ হউক বা না হউক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছাই আমার মাথার মাণিক। আমি তাঁহার ইচ্ছা-সিন্ধুর বুদ্‌বুদ্। তাঁহার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা ; তাহাই আমার ভাগ্য, তাহাই আমার মঙ্গল।

তবে কি প্রভুর ইচ্ছা আমারই মঙ্গলের জন্য ? আমি আহার করিলে তাঁহার সুখ কি ? সুখ আমার, তাঁহার নয়। তথাপি আমার আহারের আয়োজন কেন ? ভূমিতে এ উর্ব্বরতা কেন ? তরু-লতায় ফল-দায়িনী শক্তি কেন ? নদীজলে স্নিগ্ধতা কেন ? তবে কি আমার সুখ-সাধনই তাঁহার ইচ্ছা—আমার মঙ্গলেই তিনি সুখী ! আমি নামাজ পড়ি, আমারই মঙ্গলের জন্য ! কেমন করিয়া বলিব, কেন ?

নামাজে মঙ্গল হয়,—কিসের মঙ্গল ? আমি নামাজ না পড়িলে কি আসে যায় ? কোন্ মঙ্গলের অভাব হয় ? কি সুখের বিলোপ ঘটে ? দেহের এই উত্থান পতনে—বাহিরের এই আচরণে কি মঙ্গলের মাণিক জ্বলে ? কি কল্যাণের বিকাশ হয় ?

আমি সুখী, সুখের স্বর্ণ-সৌধে আমার নিবাস; হাসির হিল্লোল আমার নিশ্বাস; কাঞ্চন-কান্তি আমার অঙ্গের জ্যোতি; নামাজ পড়িয়া আমার কি হইবে?

দুঃখের অনলে আমি দগ্ধ হইতেছি। কণ্টক আমার শয্যা; অগ্নি আমার নিশ্বাস; ঘৃণা আমার ভূষণ। নামাজ আমার কি করিবে?

আমি সত্যপরায়ণ মানুষ, ন্যায় মানিয়া চলি; জ্ঞানের আলোকে বাস করি; তামসী নিশায় উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভের মত বিবেকের শুভ্র জ্যোতি আমার পথ-প্রদর্শক। আমি নামাজ পড়িয়া কি করিব? নামাজ আমার কোন্ মঙ্গল সাধন করিবে?

জীব-সেবায় এ জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; জীবের মঙ্গলের জন্য হৃদয়ের শোণিত ঢালিতেছি। জীব-সেবা-তেই জীবন-দাতার সেবা; তাহাই তাঁহার আরাধনা। আমার আবার আরাধনা কি?

যুক্তি ত অনেক করিয়া দেখিলাম, চিত্ত ত তৃপ্ত হইল না, হৃদয় ত প্রবোধ মানিল না।

আমার প্রাণের কোণে এ শূন্যতা কেন? মর্ম্মতলে তপ্ত ব্যথা লুক্কায়িত কেন? আমার হৃদয়ের সকল আনন্দ স্তব্ধ করিয়া রহিয়া রহিয়া এ হাহাকার কেন? আমি

জানি না, আমি বুঝি না, কি এ ?—কিসের ব্যথা ? কেন এ ব্যর্থতা বোধ ? কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকি, হাসির মধ্যে মজিয়া যাই, কিন্তু শূন্যতা ত দূর হয় না ; হৃদয়ের কোন্ এক নিভৃত কোণ শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয় না ! কে আমাকে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া যায় ! সুখের সৌধ ভেদিয়া কাহার স্বর শুনা যায় ! কাহার মহাধ্বনি সকল ধ্বনি স্তব্ধ করিয়া প্রাণের মধ্যে বাজিয়া উঠে ! আমার মন প্রাণ উদাস, আকুল, চঞ্চল হইয়া পড়ে !

প্রভাতের মৃদু মলয়ে কে আমার মর্ম্মতলে স্নেহ-স্পর্শ বুলাইয়া দেয় ? ঊষার সুরভি-শ্বাসে জীবনের আহ্বান আনে ? আকাশ বাতাস নিত্য নবীন জীবন-গানে পূর্ণ করিয়া জীবনধারা নবীন বেগে বহাইয়া দেয় ? আমি অবাক হইয়া ভাবি, আমি আকুল হইয়া দেখি,—আঁধারে এ আলোর মেলা ! মরণে জীবন-খেলা !—আমি মহিমা দেখিয়া চাহিয়া রই। আমার নয়ন ভরিয়া সলিল আসে, হৃদয় আমার নিবেদনের বেগে কম্পিত হয়।

সায়াহ্নে কার শান্ত শোভায় হৃদয় মন ভরিয়া যায় ? কে শ্রমের মাঝে শান্তি আনে, ভীষণতায় মধু বহায় ? কে আমাকে হিল্লোলে হিল্লোলে ডাকিয়া যায় ? বৃক্ষের

পত্রে পত্রে সোনার ধানে দুলিয়া দুলিয়া খেলিয়া যায় ? আমি ছুটিয়া যাই, আবেগে বাহু বাড়াই, আমার সমস্ত প্রাণ উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া উঠে।

থামাও, তোমার কলগান থামাইয়া দাও, তোমার আনন্দ-মেলা মিটাইয়া দাও। সন্ধ্যার মৌন অন্ধকারে বিশ্বের বিরাট ব্যথা আমার মনের সঙ্গে মিলাইয়া লই। দিনান্তের ম্লান আভায়, এ ছায়া ও মলিনতায়, এই মৌন স্বচ্ছ অন্ধকারে বিশ্বের বিষণ্ণ মুখে কিসের ব্যথা মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পায়! আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া পড়ে, হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে। মনে হয় কিছুই করা হয় নাই, কিছুই বলা হয় নাই। মিথ্যা—আমার দিনের আলো মিথ্যা, আমার কর্ম্ম-কোলাহল মিথ্যা, আমার উল্লাস আবেগ মিথ্যা। কোথায় আমার পরমাত্মীয় পড়িয়া আছে, জীবনের সর্ব্বস্ব কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহারই সন্ধান চাই, তাহারই মিলন চাই, নহিলে সবই ব্যথা ও ব্যর্থতাময়, আমার সবই শূন্য ও অন্ধকার।

আমি মৌনতামাঝে মজিতে চাই, আমি অন্ধকারে ডুবিতে চাই, অসীমে আমি মিশিতে চাই। গম্ভীর নিশার অন্ধকারে অসীমের কি প্রকাশ দেখি! বিরাটের কি মহা

আভাস বিশ্ব ভরিয়া ভাসিয়া আসে! অন্ধকারে দিগন্ত নাই, বিশ্বব্যোমের বিভেদ নাই, আকাশের অন্ত নাই, শূন্যের সীমা নাই। অসীমের সহিত সীমার সমাহারে— এই শূন্যময় স্তব্ধ গভীর মহাকালে এমন মৌন মুগ্ধ রুদ্ধ হইয়া বিশ্ব কাহার ধারণা করে? ধ্বনির পর ধ্বনি রুদ্ধ করিয়া বিশ্বময় মহাধ্বনি কাহার চরণোপান্তে উত্থিত হয়? আমি ধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া যাইব, আমি ধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া যাইব, আমি অনন্তে উত্থিত হইব।

আমার অনন্তের সহিত আত্মীয়তা আছে, মধ্য দিনের রুদ্রালোকে এই কথাই আমি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। সংসার রূপ রসের পশরা মেলিয়া প্রকাশ পায়, শব্দ ছন্দের বিচিত্র মন্ত্র পড়িয়া মায়ালোকের রচনা করে; এই চঞ্চল জনস্রোত, অপার কর্ম্মস্রোত, কর্ম্মের কোলাহল, শব্দের কল কল, অবিরাম ঝন্ ঝন্, দ্বন্দ্ব ও উপার্জ্জন, ইহারই মধ্যে মন উদাস ও বিষণ্ণ হইয়া উঠে, বিশ্ব ব্যাপিয়া ক্লান্তি ও শূন্যতা আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পায়। আমি মানুষের নয়নে বদনে শ্রান্তির মলিন ছায়া দেখি, অবসন্ন পশু পাখীর নীরবে বিশ্রাম দেখি, দূরে দূরে বৃক্ষ প্রান্তরে প্রকৃতির মূর্চ্ছা দেখি, রৌদ্র-ঝলসিত আকাশ-তলে শ্মশানের তপ্ত নিশ্বাস দেখি,—আমার প্রাণ শিহ-

রিয়া উঠে, বিপুল ব্যথায় হৃদয় আমার বিচলিত হয়। শূন্য-এ অসীম শূন্য সমস্তই মায়া ও ছায়া। মিথ্যা এ আয়োজন, মিথ্যার প্রলোভন। ছায়ার মায়ায় পড়িয়া আছি, প্রান্তরে আমি বসিয়া আছি। একা—আমি নিতান্ত একা, আমার চতুষ্পার্শ্বে সিন্ধুসলিল অনন্তে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার মাঝে বিন্দুর মত আমি পড়িয়া আছি। অনন্তে আমার যাত্রা,—ভুলিয়া কোথায় বসিয়া আছি, শব্দহীন কোন্ সীমাহীন অমৃত-লোকে আমার ঘর,—বিঘোরে কোথায় ভুলিয়া আছি।

দাও দাও শব্দ-ছন্দ স্তব্ধ করিয়া দাও, সীমার রেখা অন্ধকারে মিশাইয়া দাও, আমি নামাজ পড়িয়া অনন্তের সন্ধান লই; রূপের অতীতে ধ্বনির অতীতে সীমাহীন গভীর শান্তিলোকে উত্তীর্ণ হই; প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইয়া লই।

নামাজ ইস্‌লামের সুষমা, নামাজ ইস্‌লামের সার। আত্মার অনন্ত-তৃষ্ণা নামাজের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশমান। অনন্ত আল্লার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, এই জড়-সীমার অতীতে আমার অস্তিত্ব আছে, অনন্তের চৈতন্যলোকে আমার বসতি আছে, নামাজে তাহার প্রমাণ ও পরিচয় পাই; রূপছবির প্রবাহ মাঝে

স্বরূপের মাধুরী রচিয়া নামাজ আমায় সেই আনন্দের সংবাদ দেয়।

আমি যে অনন্তের যাত্রী, পথের ছায়ায় বাসা বাঁধি নাই; আমি যে আলোর জীব, অন্ধকারে ঘর করি নাই, আমি যে সত্যস্বরূপ, পাপের নিকট আপনাকে বিক্রয় করি নাই; কিসে ইহার পরিচয় পাইব? কিসে বুঝিব সংসার আমায় অধিকার করে নাই? স্বার্থ-কলুষে আমার সত্য পুণ্য বিসর্জ্জন দেই নাই? বলিয়া দাও, আমার ধর্ম্ম কি?—কোন পথের আমি যাত্রী? আমি কাহার সৈনিক?—আমার পতাকা কি? আমি যে সত্যময়, আমার সত্যব্রতের চিহ্ন কি?

সংসারে স্বার্থের এ মনোমোহন আহ্বান মধ্যে আমি আল্লার আরাধনা করি, পুণ্য-শক্তি প্রভুর নিকট মস্তক আমার বারে বারে প্রণত করি। "বিশ্ব-ব্যোম সৃষ্টি যাহার, তাহারই দিকে আমার মুখ" (১)—তাহারই দিকে আমার গতি। ফিরাই—আমার মুখ আমি ফিরাই, সৃষ্ট হইতে স্রষ্টার দিকে, ছায়া হইতে সত্যের দিকে মুখ আমার ফিরাই। এই যে সংসার সুখ-সোহাগে ভরিয়া

(১) ইন্নি ওয়াজ জাহ্‌তো ওয়াজ হিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতে ও আল-আরজা হানিফাঁও।

আমায় ডাক দিতেছে, ঐ যে যশের মালা, কাঞ্চন কিরীট ও রূপ-যৌবনের বিলাস-হাসি চোখের সম্মুখে দুলিয়া জ্বলিয়া খেলিয়া যাইতেছে, এই সমুদয় আমার লক্ষ্য নহে। ওই পথে আমি চলিব না; ওই খানে আমি থামিব না। এ সংসার ছায়া যাহার, এ রূপের শোভার রাশি অসীম জ্যোতির কণা যাহার, তাঁহারই দিকে আমার যাত্রা। সেই ন্যায়সত্যআনন্দময় আল্লার মুখে আমাকে চলিতে হইবে, এই সমুদয় অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিতে হইবে। আমি অংশিবাদিগণের অন্তর্গত নহি' (১)—শত শত প্রভুর পূজক নহি; আমি ধনের নহি, প্রাণের নহি, মানের নহি,—আমি একমাত্র আল্লার। আমার জীবন-সংকল্প একমাত্র আল্লার বন্দনা করিব। আল্লাহ্ ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতাময়, ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতামূলে এ জীবন উৎসর্গ করিব। "হে আল্লাহ্! পবিত্র তুমি, কৃতজ্ঞভাবে তোমারই পবিত্রতার প্রশংসা করি"; তোমার বিজয়-সঙ্গীতে আমার সকল কলঙ্ক বিলুপ্ত হয়; আমি শুচি শুদ্ধ পবিত্র হইব, পবিত্রতার দিব্য আভায় দীপ্ত হইব। "কল্যাণময় তোমার নাম" স্মরণে আমার সকল শঙ্কা বারিত হয়, সকল মোহ

(১) মা আনা মেনাল মোশরেকীন।

বিগত হয়; আমি জীব-সেবায় এ প্রাণ ঢালিয়া দিব, প্রেম-কল্যাণের মধুপ্রবাহে বিশ্বভূমি ভাসাইয়া দিব। প্রভু! "আসন তোমার মহীয়ান," তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গরীয়ান; আমার জীবন ব্যাপারে তোমার আসন সর্ব্বোপরি রক্ষা করিব, তোমার গৌরব-ধ্বজা সর্ব্বোপরি উচ্চ করিব, তোমাকে লাভ করিতে আমি মহত্বের উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিব। "তুমি ভিন্ন আর কোন প্রভু নাই, আমি পাপের শক্তি হইতে আল্লার নিকট আশ্রয় লই।"*

সংসার আমায় শত স্রোতে টানিতে চায়, রূপের ছটায় মোহিতে চায়। রজতের রিণি-ধ্বনি প্রাণের মধ্যে কি রাগিণী বাজাইয়া তুলে, প্রাণ আমার ধনের ধ্যানে মজিতে চায়। ছলনার রঙ্গীন আলোয় অযুত সুখের সৌধ ফুটে,—মন আমার সুখের নেশাতে অসৎ পথে ছুটিতে চায়। মিথ্যার কৃপায় পর্ব্বত লঘু হয়, বজ্রশিখায় জ্যোৎস্নালোক স্ফুরিত হয়, কণ্টক-বনে কুসুম-শয়ন রচিত হয়,—মন আমার মিথ্যার সহিত

---

* —সোবহানাকা আল্লাহোম্মা বেহামদেকা ও তবারাকাস্মোকা ওয়া তাআলা জাদ্দোকা অলাএলাহা গায়রোকা। আউজো-বিল্লাহে মেনাশ্-শায়তানের রাজীম।

মিশিতে চায়। দৈনিক জীবনে বহু সময়ে সম্পদ-লোভ মোহিনী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়। এমন তাহার আকর্ষণ যে জয় করিতে প্রাণের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়; জয় করিলে জীবনব্যাপী দুঃখ নিশা আসন্ন হয়। সুখ সম্পদের আশায় নহে, বহু সময়ে প্রাণের শঙ্কা বারণ করিতে জন-পরিজনের পোষণ-পথ রক্ষা করিতে অসৎ কার্য্যের আশ্রয় লইতে সমস্ত প্রাণ প্রলুব্ধ হয়। দুর্ব্বল মন আঘাতের পর আঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠে; সংগ্রামের পর সংগ্রামে বিবেক ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে; অজস্র অভাব-তাড়না ও ব্যথা বেদনার সংঘাতে সত্যবোধ ম্লান ও মন্দ হইয়া আসে!

তখন কিসে আমার আত্মার আলো নিত্য নিয়ত নবীন তেজে জ্বালাইয়া দেয়?—আমার মলিন মন মার্জ্জিত করিয়া ন্যায়-নিষ্ঠা নিশিত করে? বিবেককণ্ঠে ভৈরব-রব রহিয়া রহিয়া জোগাইয়া দেয়!

ধন্য সে মহান আল্লাহ্, মানব-মনের গুপ্ত ব্যথা অনুভব করিয়া পূর্ব্ব হইতে ঔষধ দিয়াছেন। ক্ষুধিত দেহ অন্ন ভোজনে পুষ্ট করি, তৃষিত কণ্ঠ সলিল ধারায় তৃপ্ত করি; শ্রান্ত শরীর সমীর-সেবনে স্নিগ্ধ করি; সংসারের পাপচ্ছায়ায় মলিন মন নামাজ পড়িয়া শুদ্ধ

করি; প্রতিদিন পাঁচবার আমার জীবন-সাধনা স্মরণ করিয়া সত্য তেজে বলীয়ান হই।

"হে সর্ব্বজীবের প্রভু! আমি কেবল তোমারই আরাধনা করি, কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।"* আমি দেব মানব ও প্রস্তর প্রতিমার পূজক নহি; আমি স্বার্থময় সংসারের সেবক নহি; প্রাণ মান রূপ কাঞ্চনের উপাসক নহি; রাজা জমিদার পুলিশ মহাজন আমার প্রভু নহে; জীবন-শরণ! তোমার উপরে সংসারের কিছুই আমার বরেণ্য নহে।

হে ন্যায়-পুণ্য-সত্য-স্বরূপ! জীবনের সমস্ত কার্য্যে একান্তরূপে তোমারই সাধনা করি; আর কোন শক্তি সমীপে মস্তক আমার অবনত নহে; আর কোন আকর্ষণে মন আমার প্রমত্ত নহে। দাও আমার যুগল হস্তে চন্দ্রসূর্য্য আনিয়া দাও, তথাপি আমার প্রাণের সত্য গোপন করিয়া পাপের সহিত সন্ধি করিব না। তপ্ত বালুকায় চর্ম্ম আমার দগ্ধ হউক, বারিহীন মরু-প্রান্তরে আমার জন পরিজন বিনষ্ট হউক, তথাপি হে সত্য-স্বরূপ! তোমারই উপাসনা করিব; প্রাণের পুরে তোমার যে বাণী বাজিয়াছে, কিছুতেই তাহা গোপন করিয়া দেহ প্রাণের আরাধনা

* ঈয়্যাকা নাবোদো ওয়া ঈয়্যাকা নাস্তাইন।

করিব না। আমার স্নেহের দুলাল প্রাণের নন্দন কৃপাণ ঘায় বিখণ্ড হউক, শক্তিশালী ভূপতি আমায় রোষানলে দগ্ধ করুক, তথাপি হে ন্যায়ের আধার! পাপাচারীর ক্ষমা করিয়া অন্যায়ের আশ্রয় লইব না; তোমার স্থলে পুত্র পরিজন ও পদ সম্মানের পূজা করিব না।

তবে দাও, আমায় সেই শক্তি দাও, যেন আমার সাধনা অবিচল রয়, যেন তোমার সহিত স্বার্থের দ্বন্দ্বে তোমারই বিজয়-ভেরী বজ্রনাদে বাজাইতে পারি। সংসারের প্রমোদপুর ও রণাঙ্গনে সাধশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া তোমারই ন্যায়ের নিশান মহা গৌরবে উড়াইতে পারি।

"চালাও আমায় সরল পথে চালাও",*—সত্যের স্বচ্ছ সুদৃঢ় পথে চালাও, তোমার নিকটে পৌঁছিবার শ্রেষ্ঠ সুপথে চালাও। যেন তোমার পথ ছাড়িয়া বিপথে না যাই; সুখসম্পদ ও সুবিধার আশায় কপট কুটিল কুপথে না যাই; যেন কোন ভয় ও প্রলোভনে আমি সত্য হইতে স্খলিত না হই; যেন রূপ কাঞ্চনের ছটায় আমার আত্মায় তোমার যে আলো আছে তাহা নিবিয়া না যায়, যেন দেহ-প্রাণ ধন-মান ও জন-পরিজন নাশের

* এহ্‌দেনাস্‌সেরা তাল মোস্তাকীম।

শঙ্কায় আমার প্রাণের পুরে তোমার যে বাণী আছে তাহা রুদ্ধ হইয়া না যায়।

বিপথে, তোমার রোষের পথে নহে—হে অদ্বিতীয় প্রভু! তোমার প্রতি বিদ্রোহ ও কপটতার পথে নহে, হে ন্যায়পুন্যময় সম্রাট! অবিচার ও অত্যাচারের পথে নহে,—প্রিয়তম! তোমারই প্রীতির পথে—কল্যানের পথে আমায় চালাও। যে পথে তোমার পূত নয়নের কিরণ ক্ষরে, যে পথে তোমার স্নেহাশীষের কুসুম ঝরে—সেই সত্য-সমুজ্জ্বল পুণ্যপথে আমায় চালাও। তুমি দুঃখীর ভগবান্, রহিম রহমান, দীনের প্রতি দয়ায় তোমার করুণা হয়; তুমি পুণ্য ও পবিত্রতাময়, সদাচারে তোমার সন্তোষ হয়; তুমি প্রেম ও মঙ্গলময়, সেবায় তোমার পরিতোষ হয়,—সেই সত্য পুণ্য সেবার পথে আমায় চালাও।*

"যে পথে গিয়াছে শত মহাজন
লঙ্ঘিয়া উপল গিরি দরি বন,"
প্রেম-করুণার পূত জ্যোতি ভার
হেরেছে তোমার নয়নে,—
আমি যাব যাব সে পথ শরণে।

* সুরা ফাতেহার শেষাংশের ভাবার্থ।

ধন্য সে মহান্ আল্লাহ্, এমন নামাজ পড়ার বিধান দিয়াছেন, এমন রক্ষা-কবচ মঙ্গল-মণি ললাট-ফলকে বাঁধিয়া দিয়াছেন। নামাজ আমার ইমানের উৎস, বিবেকের বল। আমি নামাজ পড়িয়া ইমানের আলো নবীন তেজে জ্বালাইয়া লই; বিশ্বাসে আমার হৃদয় মন সবল হয়; আমার বিবেক-বাণী ভৈরব রবে ধ্বনিত হয়। নামাজ পুণ্যের অমিয়-ধারা;—আমি পান করিয়া অমর হই। সংসারের ধুলিমলিন পথে চলিতে চলিতে নামাজের সত্য-সায়রে স্নান করিয়া ফুলের মত নির্ম্মল হই, সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হই।

সুতরাং নামাজ আমার জীবনসাধনার অঙ্গীকার; আমি নামাজ পড়িয়া পাপের পথে চলিতে পারি না। দিনের মধ্যে বহুবার আহার করি, নহিলে শরীর থাকে না। জ্ঞানের সাধক একই বিষয় বহুবার অধ্যয়ন করেন, নহিলে তাহা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল থাকে না। যোদ্ধা তাহার বন্দুক কৃপাণ পুণঃ পুণঃ মার্জ্জিত করে, নহিলে তাহা তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদে সক্ষম রহে না। ন্যায় সত্যের অনুভূতি প্রাণের মধ্যে নিহিত আছে, মহত্ত্বের মহিমা আমার হৃদয় ফলকে অঙ্কিত আছে; তথাপি যখন বাগ্মীর উদাত্ত কণ্ঠে ন্যায় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শুনি, মানব-সেবায় আত্ম-

ত্যাগের মহিমা শুনি, প্রাণ তখন কি আবেগে কম্পিত হয়!—মহত্ত্বের কি প্রেরণা আমার প্রাণের মধ্যে দুর্জ্জয় বেগে চালিত হয়! জন পরিজন মানুষের কতই আদ-রের বস্তু; পত্নী পুত্রের সুখের জন্য মানুষ কত না পাপে লিপ্ত হয়; কত দুঃখের বোঝা বহে। তথাপি যখন স্বধর্ম্মের অপমান-বার্ত্তা শ্রবণপথে প্রবেশ করে, স্বজাতির প্রতি উৎপীড়নের মর্ম্মবিদারক কাহিনী তাড়িত-বেগে সঞ্চালিত হয়, তখন প্রিয় পরিজনের সুখ দুঃখের কোন চিন্তাই অন্তরে স্থান পায় না; মানুষ প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্ম দেশ ও জাতির গৌরব রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়। সুতরাং আমি বিবেকবান মানুষ বলিয়াই বিবেকমাত্র যথেষ্ট নহে, বিবেকেরও পোষণ-পুষ্টির প্রয়ো-জন ও অবসর আছে। জীবসেবা আমার জীবনের সাধনা হইলেও জীবন-দাতার আরাধনা করি; পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রীতিকামনায় আমার প্রাণের মধ্যে জীব-সেবার আকাঙ্খা প্রবল হইতে প্রবলতর হয়।

আমি সংসারের-সুখস্রোত ও পাপস্রোতের মধ্যে, দুঃখের প্রচণ্ড দাহন মধ্যে বারে বারে আমার জীবন-সাধনা স্মরণ করি; ধর্ম্মের অঙ্গীকার দেহ—মনে আবৃত্তি করিয়া শুদ্ধ ও সতেজ হই।

আমি রূপ ছবির প্রবাহ মাঝে অরূপের আরাধনা করি, আমার শিরায় শিরায় আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হয়। নহি আমি সীমাবদ্ধ দেহ নহি, দেহের ক্ষয়ে আমার বিলয় নহে। আমি চৈতন্যের উপাসনা করি, জয়ের শক্তি সীমা জয় করিয়া চৈতন্যলোকে উত্তীর্ণ হইব। আমি আত্মা, অনন্ত আত্মার আলোক-আভায় ঝলসিত হই, সকল ভয় জয় করিয়া অক্ষয় আনন্দলোকে বাস করিব। আমি মাটির ধুলায় মিশিয়া যাইব না, আমি জড়-সীমায় মুছিয়া যাইব না।

আমার প্রাণের প্রভু, আমি তাহাকে দেখিতে পাই না, তাই ত আমার বেদনার অন্ত নাই, কামনার সীমা নাই। আকাশে তার আলো ভাসে, বাতাসে তার স্পর্শ আসে, বন-বিজনে আঁধার নিশায় প্রাণে তাহার ডাক শুনা যায়। সে আমার ভিতর বাহির ঘিরিয়া আছে, শিরার চেয়ে নিকটে আছে। তথাপি তাহাকে দেখিতে পাই না, ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পাই না; পাই না বলিয়াই না আমার অনুরাগের অন্ত নাই, পিপাসার অবধি নাই। পাই না বলিয়াই না দিনের পর দিন ধরিয়া ব্যথার শিখায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া শুদ্ধ হইতেছি, প্রাণের অনন্ত দল খুলিয়া খুলিয়া তাহার জ্যোতির ঝলকে মেলিয়া দিতেছি।

আমার পরম ধন পরমাত্মীয় কোথায় আছে, আমাকে তাহায় ধরিতে হইবে। রূপসীমার অতীতে সে রহস্য মাঝে গুপ্ত হইয়া বিরাজ করে ; সাধনার পর সাধনা ব্যর্থ করিয়া ছলিয়া ছলিয়া সরিয়া যায়। তাই তাহাকে ধরিতে আমার বারে বারে ব্যথা-নিবেদন, অবিরাম আমার সাধনা। অসীম পিপাসা লইয়া প্রতিদিন অশ্রান্ত পদক্ষেপে তাহার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি ; এই অসীম সাধনা শেষে যখন তাহাকে পূর্ণরূপে লাভ করিব, যে দিন এ অসীম ব্যথা পিপাসা পূর্ণ হইবে, সেদিন আমি অসীম শান্তি লাভ করিব, অসীম আনন্দে পূর্ণ হইব, অম্লান আলোকে দীপ্ত হইব।

এই আশা ও পিপাসা লইয়া বসিয়া আছি, এ প্রাণের ধারা কোন্ সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত করিব ?—এ উচ্ছ্বল আকুল সিন্ধু কোন্ সীমার তটে সংহত করিব ? আত্মার অসীম পিপাসা কোন্ দৃষ্টি সীমায় রুদ্ধ করিব ? হায় ! শিরার চেয়ে নিকটে যে বাহিরে তাহাকে কোথায় খুঁজিব ?

ভুবনের অসীম স্বামী সারা ভুবন ঘিরিয়া আছে, মনের সঙ্গে মিশিয়া আছে, মনের দুয়ার খুলিয়া তাহায় ধরিতে হইবে। অসীম রহস্য মাঝে গুপ্ত হইয়া বসিয়া আছে, অসীমের সহিত মিশিয়া তাহায় ধরিতে হইবে।

ধ্বনির পর ধ্বনি যেখানে মহাবিরামে মিলাইয়া যায়, আকাশ-ধরার তারার পারে রূপের ধারা মহাশূন্যে হারাইয়া যায়, সেই নিভৃতপুরে তাহার কাছে পৌঁছিতে হইবে। তাই তাহার বন্দনায় সীমার রেখা টানিতে পারি নাই, মূর্ত্তি ছবির গণ্ডী কাটিয়া প্রাণের এ অনন্ত তৃষ্ণা খর্ব্ব করি নাই।

বলিতে পার সসীম হইয়া কেমন করিয়া অসীমের ধারণা করি। কেমন করিয়া, তাহা কিরূপে বুঝাইব? কে প্রাণের ব্যথা বুঝিবে?—মুক্তা মণিকে জিজ্ঞাসা কর, কেমন করিয়া ক্ষুদ্র বুকে মহাসূর্য্যের জ্যোতি ঝলে, বিন্দু জলে আকাশের ছবি ফুটে? আমার এ ক্ষুদ্র নয়ন ইহার মধ্যে কেমন করিয়া বিশ্বের সমাবেশ হয়? আমি চক্ষু হইতে চমৎকার, মণি হইতে মহৎ; জড়দেহের বোধ লইয়া আমার বিচার করিও না। অসীম আমার প্রাণের তৃষ্ণা অসীমে ছুটে, আমার ধ্যানের নয়নে সীমাহীন মহাভাবের আভাস ফুটে, অনুভূতির অমৃতরসে ডুবিয়া তাহার সন্ধান পাই।

আমার মর্ম্মে তাহার অনুভূতি আছে, বাহিরে তাহাকে খুঁজিতে হয় না। মানব সমাজের কত যুগের জীবনধারা বহিয়া তাহার সমাচার আমার প্রাণের মধ্যে

প্রবেশ করিয়াছে। বায়ু-জল ও ফুলফসলে কতরূপে তাহার পরিচয় পাই; জীবন মরণ ও ভয় ভরসায় কত ভাবে তাহার প্রকাশ হয়। আভাস তাহার মর্ম্মকোষে সুবাসের মত জড়াইয়া আছে। সে আমার কত কালের পরমাত্মীয়,—নূতন কোন্ আয়োজনে তাহাকে সাধনা করিব?—তাহাকে বরণ করিতে কোন্ স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা করিব? যে আমার বাহিরে ভিতরে ঘরে দুয়ারে, তাহার আবার রূপের চিন্তা কি করিব? আহ্বানে তার আহ্বান শুনি, বন্দনায় তার সর্ব্বজীবন পরমানন্দে নন্দিত হয়।

নামাজ আত্মার মহা উত্থান, বিভুর সহিত সাক্ষাতের বিজয়-গান। কে আল্লার জ্যোতির ঝলকে স্নাত শুদ্ধ সুন্দর হইবে? অনুভূতির অনন্দ-ঘন রস সাগরে ডুবিয়া মজিয়া অমর হইবে? নবীর সহচরগণ নামাজ পড়িতেন; কর্ণ তাঁহাদের রুদ্ধ হইত; চক্ষু তাঁহাদের স্থির হইত; জড়দেহের স্পর্শ-জ্ঞান লুপ্ত হইত। স্তম্ভবোধে পক্ষী আসিয়া স্কন্ধে বসিত। কোথায় তাঁহারা বিরাজ করিতেন? কোন্ সে সাধ-স্বপনের আলোক-লোকে মহানন্দে মগ্ন হইতেন। তাঁহারা মনের নয়নে কি জ্যোতির ঝলকপানে শুদ্ধ হইতেন? প্রাণের পুরে কি

আনন্দের বাঁশী বাজিত, কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া তাহারই রাগিনী শুনিতেন। নরোত্তম হজরত আলী এমন নামাজই না পড়িয়াছিলেন! চরণে বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল; যন্ত্রনায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন; বাণ নির্গত করিতে প্রাণান্ত হইতেছিল; অস্ত্রোপচার ভিন্ন উপায় ছিল না। এমন সময়ে আজান শ্রবণে বাণবিদ্ধ চরণে তিনি বন্দনায় প্রবৃত্ত হন। নামাজ মধ্যে কঠিন বলে তাঁহার চরণ হইতে বাণ নির্গত করা হয়, কিছুই তিনি বোধ করেন নাই। নামাজে তিনি বিভু মিলনের মহানন্দে মগ্ন ছিলেন, জড়-দেহের ব্যথা বেদনা তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে নাই।

কে এমন মুক্তি-মিলনের নামাজ পড়িবে? জড়-সীমার গণ্ডী কাটিয়া প্রতিদিন পঞ্চ বারে চৈতন্য-লোকে প্রয়ান করিবে?—জ্যোতির ঝলকে পুণ্যপূত মোহন হইবে? মহা গৌরবে মহান হইবে? আজানের রবে রবে যখন আল্লার আহ্বান আসে, চক্ষু হইতে বিশ্বরূপের ছবি তখন দূরে—দূরে সরিয়া যায়, অমি শুদ্ধ স্বস্থ হইয়া প্রভু সদনে ছুটিয়া যাই। আমার নয়ন বদনের কালিম-রেখা ধুইয়া যাক, হস্ত চরণের কলুষ-স্পর্শ মুছিয়া যাক্। হে আমার কাণ ও রসনা! যত মিথ্যা কহিয়াছ, যত কুৎসা শুনিয়াছ, সকলি এখন ভুলিয়া যাও। মন আমার,

মোহের নেশা মিটাও। মাথায় আমার সংসারের কি ছবি ফুটে, লালসার কি শিখা জ্বলে, ছবি-শিখা লুপ্ত হউক। আমি ধৌত স্নিগ্ধ শুদ্ধ হইয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হই।১ নামাজ আমার উত্থান, আমি মাটির ধরায় চরণ রাখিয়া ঊর্দ্ধে আমার শির তুলিয়া মহান আল্লার বন্দনা করি। সত্যময়ের বন্দনায় আমি সুদৃঢ় ও সবল হই। আমার চরণে তলে জড়ের মায়া লুণ্ঠিত হয়, জড় দেহের কাম-কামনা পায়ের তলে মর্দ্দিত হয়। সংসারের রূপ রসের পশরা আমার নয়ন হইতে বিলুপ্ত হয়। বিশ্বধ্বনি দূরে শুনি; ধ্বনির পর কত ধ্বনি মহা বিরামে মিলাইয়া যায়, কায়ার গণ্ডী সীমার রেখা মহাশূন্যে মিশিয়া যায়। তখন আমার গৃহাঙ্গনের চিহ্ন থাকেনা, বৃক্ষ শৈল দৃষ্টি সীমা রুদ্ধ করেনা; আকাশ নাই, বাতাস নাই, বন্ধন নাই, অসীম শূন্যে অসীম ভাসে, অসীমের অনুভূতিতে মন অবিচ্ছেদে পূর্ণ হয়। মনে হয় চৈতন্যের মহাতরঙ্গ আমার সম্মুখে আমি বিদ্যু-বিদ্ধ দণ্ডের মত কম্পিত হইতেছি; মহাসূর্য্যের জ্যোতির ঝলক আমার বক্ষে, আমি শিশির-কণার মত আকৃষ্ট হই-তেছি! বিশ্ব ভুবনের মহামহীয়ান সম্রাট আমার সম্মুখে, আমি আকুল মনে প্রাণের পূজা নিবেদন করিতেছি।

---

১ ওজুর কথা

"মহান আল্লাহ্ মহীয়ান,—সৃষ্টির প্রভু গরীয়ান, অসীম-করুণ দয়াবান, দিনের প্রধান, তাহারই সর্ব্ব গুণের গর্ব্ব—তাহারই নিখিল গৌরব-গান।" ১

আমি তাহার গান করিব। আমার প্রভু আমার পাতা, তাহার কাছে প্রাণের কিছু কথা কহিব।

কে আমাকে উৎস করিয়া জীবনধারায় বহাইয়া দিল? কোন্ সে প্রিয় আমায় স্নেহের করুণা-রসে পোষণ করিল! কাহার নিকট গমন-ব্যথায়—কাহার অপার জ্যোতির ঝলক দরশ-পানের পরম তৃষায় প্রাণের প্রাণ আকুল আবেগে পূর্ণ হইল! তাহার কাছে প্রাণের নিবেদন ব্যক্ত করির। সে যে আমার জীবন-উৎস—চরম লক্ষ—চরমে তাহার নিকট পৌঁছিব। তাহার আশা শিরায় শিরায় ধরিয়া আছি; তাহার জন্য হৃদয় মাঝে কত মাধুরী ভরিয়া আছি; প্রাণের পুরে কত উৎস রচিয়া আছি; এ উৎসব প্রকাশ করিব; এ অনুরাগ কথার ধারায় ঢালিয়া দিব; তাহার গৌরবগানে দিক্‌দিগন্ত অনন্তকাল পূর্ণ করিব। নামাজ মধ্যে প্রভুর সহিত মিলন-বোধে পরমান্দ-পিয়াসী আত্মায় আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়; আমি সে আনন্দ ভিতর

---

১ সুরা ফাতেহার প্রথমাংশ—"আলহাম্‌দো......ইয়াওমিদ্দীন।"

বাহির সর্ব্বাবয়বে অনুভব করিব। নিশ্বাসে নিশ্বাসে বাণীর পর বাণী বলিয়া অনুরাগে প্রভুর প্রশংসা করিলে প্রাণের কোন্ অতল হইতে অতুল অমিয় আনন্দ সিন্ধু উথলিয়া উঠে, শিরায় শিরায় সুখ-স্রোত সঞ্চালিত হয়।—আমি আল্লার মহিমা-গানে অণুপরমাণু আনন্দবেগে কম্পিত করিব।

ধন্যবাদ সেই মহান আল্লাকে ধন্যবাদ।—মহাশক্তি-ময় বিকাশক, করুণাময় পালক ও ন্যায়ময় বিচারককে ধন্যবাদ।—সৃজন তাহার মহিমা, জীবন তাহার করুণা, ত্রাণ তাহার গরিমা, তাহাকে ধন্যবাদ। কোটি কোটি ভুবন জীবের মহাস্বামী,—ইঙ্গিতে তার লক্ষ সূর্য্য গ্রহ চলে, গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় জীবনের জ্যোতি খুলে, অন্তহীন তার দয়ার ধারা সাধু সজ্জন পাপী তাপীর তৃষিত কণ্ঠে সমান ভাবে সুধা ঢালে, চরমে তারই করুণাকোলে মোক্ষের কাম্য মাণিক জ্বলে,—তাহাকে ধন্যবাদ। তাহার মহামহিমা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই; ভাষার সে প্রকাশ নাই; প্রকাশের সে শক্তি নাই; সে মহিমা অগাধ ও অপার। যত শক্তি আছে, যত সিদ্ধি আছে,—যত মহিমা ও গরিমা আছে, সকল শক্তির সকল স্তুতি—সকল গুণের গৌরব-গীতি একমাত্র

আল্লার,—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিরকালের সমস্ত প্রশংসা আল্লার।

একমাত্র তাহারই মহিমা মূলীভূত রসের মত জীবন ব্যাপার ফুলে ফলে ফুটাইয়া তুলে; জীবনের অন্তহীন অজস্রপথে বিকাশ করিতে, পোষণ করিতে, সকল কর্ম্ম সফলতায় মণ্ডিত করিতে তাহারই শক্তি আদি অন্ত পূর্ণ করিয়া বিরাজ করে। আমাকে দুঃখ বিপদে রক্ষা করিতে মানবদেবতা পীর পয়গম্বর আর কাহারও শক্তি নাই; আমার সুখ সম্পদ ও আনন্দের জন্য আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাহারও প্রশংসা নাই। এই যে জননী স্নেহের রসে পোষণ করে, এই যে পিতার সবল বাহু মানুষরূপে গঠন করে, এই যে প্রিয়ার মধুর প্রেম জীবন মন আনন্দধারায় সরস করে—ইহার মধ্যে সেই আল্লারই স্নেহের পীযুষ ক্ষরিত হয়। আল্লাই বান্ধব দিয়া নিরাশ প্রাণে আশার নবীন কিরণ জ্বালে—সাধু দ্বারা আঁধারে আলোক ফুটায়, বীরের বলে অনল সলিল শত্রু হইতে রক্ষা করে। তাহারই সমস্ত প্রশংসা ও মহিমা গান। জীবনের সমস্ত কার্য্য কল্যাণের জন্য সেই আল্লারই স্তুতিবন্দনা।

মহামহীয়ান সম্রাট সে, দূরে দাঁড়াইয়া সম্ভ্রম করিয়া

কথা কহিলাম ; প্রাণের তৃষ্ণা তৃপ্ত হইল না। আমার আদি, মধ্য ও অন্তের স্বামী—আমি তাহাকে আরো নিকটে আপন করিয়া পাইতে চাই। তখন দ্বিধা দূরত্ব দূর হইল। কাঁদিয়া কহিলাম, হে আমার উৎস, আমার প্রিয়, আমার লক্ষ্য !—আমি আর কিছু জানি না ও চাহি না,—'শুধু তোমাকেই আরাধনা করি'—তোমাকেই কামনা করি। তোমাকে লাভ করিতে 'তোমারই কাছে সাহায্য চাই।' প্রভু আমার! আশা আমার পূরাও, আমাকে তোমারই কাছে টানিয়া লও। যে পথে শীঘ্র তোমার নিকট পৌঁছিতে পারি, সেই সরল পথে আমায় চালাও। প্রাণের প্রভু, তোমার রোষ হইতে মাথা আমার সরাইয়া দাও ; ভুল হইতে পদ আমার ফিরাইয়া দাও ; তোমার কল্যাণময় প্রীতির পথে আমায় চালাও। ১

'আল্লাহো আকবর'—আল্লাই শ্রেষ্ঠতম সুমহান,—রূপ-রত্ন জন প্রাণ সর্ব্বোপরি মহীয়ান। প্রভুর গৌরব-রবে প্রাণ আমার পুলকাবেগে কম্পিত হয়, ভক্তি-রসে হৃদয় ভরে, আমার দেহ-মস্তক আনত করিয়া গোপনে আমার প্রাণের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। 'আমার প্রভু

১ সুরা ফাতেহার শেষাংশের ভাবার্থ।

পবিত্র ও সুমহান'—'মুক্ত পূত বিশাল বিরাট মহীয়ান'। ১ সত্য করিয়া বলিতেছি, হে দয়িত! তোমার চেয়ে আর কিছুই বৃহৎ ও মহৎ নয়,—তুমিই 'পবিত্র প্রভু বিশাল বিরাট মহীয়ান।' আদেশ তোমার মাথা পাতিয়া সর্ব্বোপরি গ্রহণ করি, বিধান তোমার জীবন মাঝে সর্ব্বোপরি বরণ করি।

মনে হয় প্রভু আমার বিনত-অঙ্গ স্নিগ্ধ করিয়া শত স্নেহে চাহিয়া আছেন; তাঁহার দিব্যজ্যোতি দেহের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার করুণাধারা মাথার উপরে অজস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে। আমাব জীবন· স্বামী প্রাণের প্রভু,—তাহার আমি আরো নিকটে পৌঁছিতে চাই তাহার কাছে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া লুটিতে চাই—সর্ব্বস্ব আমার নিবেদন করিতে চাই।

'আল্লাহো আকবর'—হে মহান! আমার শিরদ্বারা তোমাকে সেজ্‌দা (২) করি—মস্তক আমার লুণ্ঠিত করিয়া তোমাকে প্রণতি করি।—'আমার প্রভু পবিত্র ও মহান হইতে সুমহান।' (৩) আকাশ তোমায় ছুঁইতে পারে না,

১ রুকু—সোবাহানা রব্বী আল আজীম (৩ বার)।
২ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।
৩ সোবহানা রব্বীআল আলা (৩ বার)।

দর্পদম্ভের তুঙ্গ শির তোমার কাছে পৌঁছিতে পারে না। রূপ-কাঞ্চন-সিংহাসন, অসি-শক্তির আস্ফালন কিছুই তোমায় ধরিতে পারে না। যত কিছু শক্তি আছে, সকল শক্তির ঊর্দ্ধে তুমি, উন্নত শিরের উপরে তুমি!— 'সুপবিত্র সুমহান—মহান হইতে মহীয়ান।'—তাই আমি দীন হইতে দীন হইয়াছি, মাটির ধূলায় মিশিয়া গিয়াছি। 'হে পবিত্র ও মহান প্রভু!' সকল শক্তির উপরে তোমায় বরণ করি। আমার শির ও শরীর দ্বারা তোমার বন্দনা করি, আমার মন, রসনা ও নাসা নয়নে তোমার অর্চ্চনা করি, আমার চর্ম্ম মর্ম্ম সর্ব্বস্ব তোমায় নিবেদন করি।

ওগো! শব্দ ছন্দ থামাইয়া দাও, চন্দ্র সূর্য্য নিবাইয়া দাও; আমার চক্ষুকর্ণ রুদ্ধ হউক, সত্তা আমার লুপ্ত হউক; আমি সীমাহীন মহাশূন্যে মিশিয়া যাই। এই ভুবনে আর কেহ নাই, আর কিছু নাই,—আকাশ ভূতল অতল ব্যাপিয়া—সীমাশূন্য অসীম ভরিয়া চৈতন্যের সুধা তরঙ্গে আমি ডুবিয়া যাই; আমি আল্লার অনুভূতিতে মিশিয়া মুছিয়া যাই।

মুছিয়া যাওয়ার কি আনন্দ, তাহা কিসে বুঝাইব? গভীর অতল সিন্ধুজলে মিলিয়া নদি-জীবনের কি সার্থকতা,

কে বুঝিবে? আমি থাকিতে আনন্দ নাই; আমার সম্ভোগ-সুখে শিখা আছে, তাহাতে সর্ব্বজীবন-স্নিগ্ধকারিণী তৃপ্তি নাই। আপনাকে বিলাইয়া দেওয়াই পরমানন্দ; হারাইয়া যাওয়াই চরম সুখ। প্রিয় দ্রব্য সন্তানকে ভোজন করাইয়া জননীর সর্ব্বাবয়বে কি আনন্দ প্রকাশমান! স্বামীর জন্য শত লাঞ্ছনা বরণ করিয়া বিবি রহিমা কি আনন্দে আত্মহারা! পুত্রের জন্য জীবন দ্বারা জীবন মাগিয়া বাবর-প্রাণে কি সুখের তরঙ্গ-লীলা। ষ্টেড্ কেন টাইটানিকে ডুবিয়া মরিল; হাজী মহ্সীন সকল বিলাইয়া কাঙ্গাল সাজিল! জন হাওয়ার্ড রোগের কবলে জীবন দিল।

সাধারণ মানুষ পুত্রপরিবারের সুখের জন্য হৃদয়ের রক্ত ঢালে, মহাপুরুষ মানুষের মঙ্গলতরে জীবন শোণিত প্রদান করেন। অন্যের জন্য জীবন ধারণে মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা, অন্যের মধ্যে ডুবিয়া ও মুছিয়া যাওয়া মানুষের পূর্ণানন্দময় পরিণাম।

আত্ম লইয়া আমি তৃপ্ত নহি, জীবন আমার আর কাহাকেও নিবেদন করিতে চাই। কে আমার বাঞ্ছিত জন, কাহাকে আমার জীবন দিয়া জন্ম আমার সার্থক করিব? ক্ষুদ্র লইয়া আমি বাঁচিতে পারি না, নিজেই যে ভাঙ্গিয়া

ও মুছিয়া যায়, তাহার মধ্যে ডুবিয়া আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিতে পারে না। আমি চাই চিরসত্য ও চিরানন্দ, মরণে মহাজীবন। তাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও মধুর যে, আমার উৎসব ও লক্ষ্য যে, সেই 'পরম পবিত্র মহামহীয়ান প্রভু'র' কাছেই সর্ব্বস্ব আমার লুণ্ঠিত করি, তাহারই মধ্যে অস্তিত্ব আমার লুপ্ত করিয়া অক্ষয় আনন্দে মগ্ন হই।

আনন্দ—সে পরমানন্দ, ভাষায় তাহা প্রকাশের নহে। সেজ্‌দা আমার স্বরূপ, বন্দনা আমার আনন্দ গান। রবির পানে নয়ন মেলিয়া কুসুম ফুটে, শাখায় বসিয়া বিহঙ্গ তাহার প্রাণের সুধা কণ্ঠে ঢালিয়া আনমনে কুজন করে, তরঙ্গ-রঙ্গে তটিনীর প্রবাহ চলে, চঞ্চল সমীর হিল্লোল তুলিয়া নিত্যনিয়ত ছুটিয়া যায়। জলতরঙ্গ, সমীরস্রোত ও কিরণমালায় জীবনের সৃষ্টি কল্যাণ সাধিত হয়; তথাপি বুঝি নাচিয়া তটিনীর আনন্দ আছে, বহিয়া বায়ুর সুখ আছে, কিরণদানে জ্যোতিষ্কপুঞ্জের মনে মনে বিলাস আছে। আমার অবস্থানেও হয়ত বিশ্বের বর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন হয়, আমার আত্মনিবেদনেও হয়ত পুত্রপরিজন ও বহু মানবের কল্যাণ হয়; কিন্তু সেজ্‌দা করিয়াই আমার আনন্দ। সেজদাই আমার

গতি ও পরিণতি; আমার সমস্ত সুখসোহাগ ও সাধ-কামনার ধারা বহিয়া ঐ সেজদা।

এই বিচিত্র জীবন-ধারা কোথায় আমি বাহিয়া চলিব?—কোথায় আমার সমাপ্তি ও সার্থকতা হইবে? জীবনের এই শত সংগ্রাম, তরঙ্গ-ভঙ্গ কোথায় যাইয়া শান্ত হইবে—কোথায় আমার প্রতিপলের উল্লাস বিকাশ পূর্ণদলে প্রস্ফুট হইয়া চির শান্তির জ্যোতির তলে স্থির হইবে?

তাই সেজ্‌দা আমার স্বপ্নসুখ ও চরম সাধ। যে আমায় ফুল করিল, আমার মাধুরী তাহায় উপহার দিব। আমার জীবনধারা যে চালিত করিল পথে পথে ফুল ফসলে ক্ষেত্র ভরিয়া তাহার কাছে যাইয়া আমি শান্ত হইব। প্রতিদিন বারে বারে তাহার কাছে প্রাণের ধারা ঢালিয়া দিব - তাহার কাছে প্রাণের গান শেষ করিব।

সেজ্‌দায় চিন্তার শেষ, দ্বন্দ্বের শেষ, দুঃখের শেষ। জীবন-সংগ্রামে ছিন্নকান্ত বিষণ্ণ মন প্রভুর কাছে নিবেদন করি, আশা কামনা ভয় ভাবনা বিসর্জ্জন দেই। আমার শক্তির স্পর্দ্ধা নাই, জ্ঞানের গর্ব্ব নাই, কামনার তাড়না নাই। তুমি যাহা দিয়াছিলে, নাথ! তাহা তোমারই কাছে বহিয়া আনিয়াছি; আমার সর্ব্বস্ব তোমায় সমর্পণ

করিতেছি ; আমি আর কিছু জানিনা, প্রভু আর কিছু বুঝিনা ও চাহিনা। আমার সকল দ্বন্দ্বের অবসান—আমার মুক্তি শান্তি ও সার্থকতা।

সেজ্‌দার সময় মনে হয় প্রভুর কাছে চিরকাল ধরিয়া লুটি না কেন ? সেজদা করিলে অতীন্দ্রিয় আনন্দ-ঝঙ্কারে বিশ্বভুবন পূর্ণ হয়, লক্ষ লক্ষ কুসুম ফুটিয়া হাসিয়া হাসিয়া ঝরিয়া পড়ে, সুবাস তাহার মণ্ডলে মণ্ডলে ভাসিয়া আসে,—আমি সেজদায় পড়িয়া মরিনা কেন ? আমার দেহ প্রাণের কণায় কণায় কামনা ফুটে,—আমি কামনা হইয়া থাকিনা কেন ? আমার চারিদিকে কায়ার এ কারা কেন ? আমার উপরে বক্ষের এ প্রাচীর কেন ?—আমায় রেণু রেণু করিয়া ভাঙ্গিয়া দাও, আমি অনুভূতির অমৃত-তরঙ্গে মিশিয়া যাই।

'আমার প্রভু সুপবিত্র সুমহান'—মহান হইতে মহীয়ান ; 'আমি তাঁহার প্রশংসা করি। প্রশংসায় তাঁহার আনন্দ নয়, তাহাতে আমারই প্রাণের তৃষ্ণা প্রকাশ হয়। মহামহীয়ান প্রভুকে আমি কি উপহার প্রদান করিব ?—কোন্ উপহারে আমার প্রাণের অনুরাগ তৃপ্ত হইবে ? যে আমার পরম দয়িত, তাহাকে আমার কিছু বলিবার আছে। আমি কি কথায় আমার প্রাণের

তৃষ্ণা ব্যক্ত করিব? তাঁহার মহিমাদর্শনে বিমুগ্ধ হই, করুণা স্মরণে আত্মসত্তার বিস্মৃতি ঘটে; আমার সর্ব্ব-জীবন আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহারই মহিমা-আভা বিকশিত হয়; আমার মর্ম্ম ভেদিয়া কণ্ঠ ভেদিয়া তাঁহারই মহিমা-বাণী নির্গত হয়। আমি আপন হারাইয়া তাঁহার প্রশংসা করি। তিনি মুক্ত নির্ম্মল পবিত্রতা, তাঁহার কাছে ইহা ভিন্ন আর কোন বাণী হইতে পারে না,—আমার প্রভু সর্ব্ব উচ্চ সুমহান। প্রভুর জন্য ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রশংসা আর কিছুই বলিতে পারি না।

যদি প্রশংসা না করিয়া প্রার্থনা করিতাম, যদি ব্যথা-কামনার কথা কহিতাম, তবে আমার সেজ্‌দা ব্যর্থ হইত, আমার আত্ম-বিসর্জ্জনের কোনই অর্থ থাকিত না। যেখানে প্রভুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, সেখানে সৃষ্টির রূপ থাকিবেনা। যখন আমি সেজ্‌দা করিব, তখন আমি নিঃশেষে লুপ্ত হইব, আমার কোন দাবী ও চিহ্ন থাকিবেনা। 'মরিবার পূর্ব্বে মরিয়া যাও,' তবেই জীবন পাওয়া যাইবে। ত্যাগেই ভোগের সার্থকতা, তাহাতেই ভোগের চরমানন্দ নিহিত আছে। আমি আত্মহারা হইয়া প্রভুর পবিত্রতা স্মরণ করি; আমি তন্ময় হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করি; আমি

অজ্ঞাতসারে তাঁহার রসে রসিয়া যাই, ও তাঁহার রঙ্গে রঙ্গিন হইয়া উঠি।

একদিন আমি মুক্ত পূত মহান ছিলাম; অধ্যাত্মের মহামহিম উচ্চলোকে আমার বসতি ছিল, আমি প্রভুর নিকটে পরমানন্দে মগ্ন ছিলাম। তখন জড় আমাকে হীন করে নাই; কলুষ আমাকে মলিন করে নাই; আমি প্রভাতের রবিকরোজ্জ্বল শিশির-স্নাত শুভ্র স্ফুট শতদল হইতে নির্ম্মল ছিলাম, বালারুণের কিরণ হইতে মোহন ও তপন হইতে মহান ছিলাম।

আমার সে গৌরব কি হইল? সে মহিমা কোথায় গেল? চাই আমি উচ্চ হইতে উচ্চলোকে উঠিতে চাই, আমার সেই মহামহিম ও মুক্ত পূত আত্মরূপে ফিরিতে চাই। তাইত আমি বারে বারে পরম পবিত্র প্রভুর কাছে লুণ্ঠিত হই, লুটিয়া আমার তৃষ্ণা মিটে না। আমি সেজ্‌দায় প্রভুর সন্নিহিত হই, অনুভূতির অমৃতরসে ডুবিয়া যাই, 'পবিত্র ও মহান প্রভু'র সান্নিধ্যে আমার সত্য-স্বরূপ উপলব্ধ হয়; মহামহিমার নিত্য-পূত-গৌরব-গন্ধ আমার মর্ম্মদল আকুল করিয়া প্রকাশ পায়।

তাই ত এই পৃথিবীতে বিচ্ছেদ-বোধের ব্যথা আমার মর্ম্মতলে ক্ষতের মত লুক্কাইত আছে, তাই ত আজানের

আহ্বান-রবে বহু পুরাতন প্রিয় স্মৃতি দূরাগত বীণা-ধ্বনির মত, শত-সুখ-স্মৃতি-বিজড়িত শৈশব-লীলানিকেতনের দৃশ্যের মত, স্বপ্নদৃষ্ট অপূর্ব্ব আনন্দস্থলীর স্মৃতির মত প্রাণের মধ্যে ভাসিয়া আসে, সমস্ত প্রাণ উদাস ও চঞ্চল হইয়া উঠে, ক্ষুধিত মর্ম্ম নিবেদনের আবেগে দুর্ণিবার বেগে কম্পিত হয়। আমি আপনাকে আল্লার কাছে নিবেদন করিব, নিঃশেষে আমি লুপ্ত হইব, সর্ব্বস্ব আমার অর্পণ করিয়া আত্মরূপে ফিরিয়া যাইব। আমি উত্থানে তাহার অর্চ্চনা করি, বিনত অঙ্গে বন্দনা করি, দেহ-মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণতি করি, তথাপি আমার প্রাণের তৃষ্ণা তৃপ্ত হয় না। আমি যে আল্লার তাহা আমি সর্ব্বপ্রকারে বুঝাইতে চাই, আমার ব্যথা-নিবেদন সর্ব্বাবয়বে ফুটাইতে চাই। আমি উত্থানে পতনে, লুণ্ঠনে উপবেশনে তাহার, আমার গতি ও স্থিতি, আমার কর্ম্ম ও বিরাম সকলি তাহার নিমিত্ত। আমি বসিয়া আল্লার বন্দনা করি, পর্ব্বতবৎ অটল হইয়া প্রাণের সঙ্কল্প ব্যক্ত করি, 'সমস্ত প্রশংসা ও বন্দনা আল্লার নিমিত্ত, সমস্ত পবিত্রতা তাহার।'* কাহার কিরণ বিশ্বভুবন মোহন করিয়া বিরাজ করে! কাহার শক্তি মূলীভূত রসের মত জীবন

* "আত্‌তাহিয়্যাতো লিল্লাহে ও আস্‌সালাতো ও আত্‌তায়্যেবাতো।"

ব্যপার ফুলে ফলে ফুটাইয়া তুলে!—সে আমার আল্লার—আমার আল্লার। তাই ত আমি আর কাহারও শক্তি-জ্যোতিঃ দেখিতে পাই না, আর কাহারও কিরণ-তলে নয়ন মেলিয়া প্রাণের কুসুম বিকশিত হয় না। তাই ত আমার সকল সাধনা সফল করিয়া হে দয়িত! তোমারই মহিমা-গান; আমার সকল আরাধনা—সাধ-কামনা তোমাকেই ঘিরিয়া গুঞ্জরমান। প্রভু! প্রাণের যত আশা, কণ্ঠের যত ভাষা, তাহাতে তোমারই পিপাসা ও মহিমা ফুটে; আমার দেহের যত কর্ম্ম তাহা তোমারই গৌরবের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

প্রভু! সকল পবিত্রতা তোমার, তুমিই পবিত্রতার আধার। তাই ত শুধু তোমারই লক্ষ্যে জীবন-প্রবাহ চালিত করিতেছি, তুমিই আমার লক্ষ্য-মোক্ষ ও জীবন জনমের সাধনা। আমার সাধনা কিসে সফল হইবে?—কি উপায়ে আমার এই স্তুতিবন্দনা সার্থক ও চরিতার্থ হইবে? বন্দনায় তোমার আনন্দ নয়, প্রশংসায় তোমার প্রয়োজন নাই, আমি কেমন করিয়া তোমার প্রীতির কার্য্য সাধন করিব?—তোমার প্রিয় যাহারা, তোমার পথের যাত্রী যাহারা. তাহাদের সেবায় তোমারই পরিচর্য্যা হয় তাহাদের প্রতি প্রেম-পোষণে, প্রিয়তম! তোমারই

প্রতি প্রাণের নিবেদন পরম গৌরবে পরিপূর্ণ হয়। তাই আমার মঙ্গলের সহিত তাহাদের মঙ্গল মিশ্রিত করিয়াছি, তাহার মঙ্গল-কামনায় হৃদয়-দুয়ার মুক্ত করিয়াছি। প্রভু! যিনি তোমার মহিম-জ্যোতিঃ জগত মাঝে উজ্জ্বল করিলেন, যিনি আমাকে তোমার পথে চালিত করিলেন, যিনি তোমার সন্নিহিত হইয়া মানুষের মহা-মহিম গৌরব-স্মৃতি জাগ্রত করিলেন, তোমার দাস ও প্রেরিত সেই বিশ্ব-বন্ধু নবীর প্রতি তোমার শান্তি, করুণা ও কল্যাণ রাশি বর্ষণ কর। ১ হে আল্লাহ্! 'আমাদের উপরে—তোমার পথের যাত্রী ব্রতী যোদ্ধা যাহারা—তোমার সেই ভক্ত সেবক সাধকদিগের উপরে, সৎক্রিয়াশীল সাধুসজ্জন-দিগের উপরে তোমার চির মঙ্গল শান্তিবারি বর্ষণ কর।'২ প্রভু, তোমার স্নেহ-করুণার মঙ্গলধারা জীবন মরণ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হউক। তোমার দিব্যজ্যোতিঃ ও আশীষ-সম্পাতে সর্ব্বকাল উজ্জ্বল ও পবিত্র হউক। 'হে আল্লাহ্, মার্জ্জনা কর আমায় ও মাতাপিতায় ও পরবর্ত্তী সন্ততি-গণকে, যাহারা একান্তরূপে তোমাকেই জীবনের সাধনা

১ আস্সালামো আলায়কা আই-ইওহান্ নবীও।
"আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু ওয়া রসুলোহু" ভাবার্থ।
২ "আস্সালামো আলায়না......সালেহীনা।

করিয়াছে, যাহারা একান্তরূপে তোমাতেই আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছে, তোমাময় সেই বিশ্বাসী ও মোস্লেম-গণকে মার্জ্জনা কর ;—পুরুষ হউক, স্ত্রী হউক, জীবিত বা মৃত হউক, হে পরম ও চরম দয়াল ! দয়া করিয়া তাহাদের সকলকে তুমি মার্জ্জনা কর।' ১

এই মার্জ্জনায় মোহন হইতে, পবিত্র ও মহান্ হইতে মহান আল্লার বন্দনা করিতেছি ; তাহার প্রীতির জন্য প্রাণের পুরে পর মঙ্গলের মধু ভরিয়া তাহার পানে প্রতি-দিন প্রস্ফুট হইতেছি ; তাহার আশা ও পিপাসা লইয়া অসীম-রহস্য-দ্বারে বারে বারে আঘাত করিতেছি ; একদিন রহস্য মুক্ত হইবে, এ দূরত্ব দূর হইবে, আমার সকল হাহাকার শান্ত করিয়া, আমার সর্ব্ব জীবন সফল করিয়া তাহার পরম শান্তি মহিমজ্যোতিঃ প্রকাশ হইবে।

সমাপ্ত

† দোওয়া মাসুরা